সেলিম রেজা নিউটন
বিদ্রোহের সপ্তস্বর
বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়
বিডিআর-বিদ্রোহ নিয়ে ক্লাসরুম-পর্যালোচনার অডিও-অনুলিপি

বিজ্ঞপ্তি

সেই ২০১০ সালের উইন্ডোজ/বিজয়ে তৈরী এই বইয়ের আদি ডক ফাইলটা আমার বর্তমান লিনাক্স/মিন্ট কম্পিউটারের লিব্রারাইটারে খুলে কোনো রকমে এই পিডিএফ ফাইলটা দাঁড় করানো হয়েছে। হঠাৎ চোখে পড়ে যাওয়া এক-আধটা বানান শুধরে দিয়েছি।

সেলিম রেজা নিউটন, ৬ই অক্টোবর ২০১৮

বিদ্রোহের সপ্তস্বর: বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়

বিডিআর-বিদ্রোহ নিয়ে ক্লাসরুম-পর্যালোচনার অডিও-অনুলিপি

সেলিম রেজা নিউটন

যেহেতু বর্ষা
২৭৫/জি, ধানমণ্ডি ২৭, ঢাকা

সুস্মিতা চক্রবর্তীর প্রতি

'ভবিষ্যত কিংবা অতীতের প্রতি—
সেই সময়ের প্রতি, যখন চিন্তা স্বাধীন,
যখন মানুষ একে অপরের চেয়ে আলাদা,
এবং তারা নিঃসঙ্গ জীবপনযাপন করে না;
সেই সময়ের প্রতি—
যখন সত্য অস্তিত্বমান,
এবং যেটা করা হয়ে গেছে সেটাকে আর উল্টানো সম্ভব নয়।'
(জর্জ অরওয়েল, ২০০১)

বিদ্রোহের সপ্তস্বরঃ বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়
বিডিআর-বিদ্রোহ নিয়ে ক্লাসরুম-পর্যালোচনার অডিও-অনুলিপি
সেলিম রেজা নিউটন

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রকাশকঃ সৈয়দ সাজ্জাদ আহমেদ
যেহেতু বর্ষা
কনকর্ড রয়াল কোর্ট, ৩য় তলা এ-৬
বাড়ি নং ২৭৫/জি, সড়ক ২৭ (পুরাতন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা। ফোনঃ ৯১১৬৯০৮
jehetuborsha@gmail.com

প্রচ্ছদের মূল ছবিঃ মনিরা শরমিন প্রীতু
প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জাঃ সেলিম রেজা নিউটন

মুদ্রণঃ কমলা প্রিন্টার্স

The Octave of Rebellion: From BDR to Universities
An audio transcript of the classroom critique about BDR rebellion
by Salim Reza Newton

First Published: February 2010
Jehetu Borsha
Dhaka

কৈফিয়ৎ ও কৃতজ্ঞতা

বিডিআর-বিদ্রোহের দ্বিতীয় দিনে, ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯, বেলা তিনটার সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে 'বিএসএস (সম্মান) পার্ট ৩' এর *এমসিজে ৩০৬: বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি* কোর্সের পূর্বনির্ধারিত একটি ক্লাসে আগে-থেকে-প্রস্তুতি-না-নেওয়া এই আলোচনাটি পেশ করা হয়েছিল। এই রচনা সেই ক্লাসরুম-পর্যালোচনারই হুবহু, পাদটীকা-সংযোজিত প্রতিবেদন।

এটা ছিল মোট এক ঘণ্টা ৪১ মিনিট ৪১ সেকেন্ডের একটা আলোচনা। ধারণ করা হয়েছিল দুইটা অডিও-ফাইল হিসেবে। প্রথমটা এক ঘণ্টা ৩৩ মিনিট ৩৫ সেকেন্ডের। দ্বিতীয়টা আট মিনিট ৩০ সেকেন্ডের। আলাদা-আলাদাভাবে তৈরী কাঁচা-কিন্তু-কম্পোজকৃত অনুলিপি-টুকরাগুলো প্রথমে মূল অডিওর সাথে শুনে শুনে মিলিয়ে নিয়েছি। সেগুলো জোড়া দিয়ে প্রস্তুত করেছি পুরো আলোচনাটির হুবহু সময়াঙ্কিত-অনুলিপি। পুরোটাকে পরে আবার মিলিয়ে দেখেছি। অতঃপর বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা অনুসারে অনুচ্ছেদগুলো কয়েক জায়গায় আগে-পরে করে সাজিয়েছি। সর্বত্রই প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শেষে ৩য় বন্ধনীর ভেতরে ছাইরঙা হরফে অডিও-ফাইলের সময়াঙ্ক দেখানো হয়েছে '[ঘণ্টা:মিনিট:সেকেন্ড]' আকারে। কৌতূহলী পাঠক চাইলে আদি অডিওর সাথে অনুলিপি মিলিয়ে দেখতে পারেন। অডিও-রেকর্ড আমার কাছে আছে। অনলাইনে তোলার চেষ্টা করছি।

পরিশেষে, পুরো টেক্সট্‌টাকে সামগ্রিকভাবে ঘষামাজা করেছি। ঘষামাজা বলতে প্রধানত বাহুল্য শব্দ-বাক্য-বাক্যাংশ বাদ দিয়েছি। কারণ এগুলো নেহাতই কথার বোঝা, বাক্যের মেদ। কোথাও-বা পুনরুক্তি-মাত্র। দিব্যি বাদ দেওয়া যায়। অন্য দিকে, কোথাও-বা দুই-একটা বাক্য যোগ করেছি; কোথাও কোথাও আস্ত অনুচ্ছেদও। সংযোজনীগুলো *তৃতীয় বন্ধনীর ভেতরে* রেখে দিয়েছি যেন চেনা যায়। এসবের বাইরে কোথাও কোথাও সামান্য এদিক-ওদিক (আগের শব্দ পরে, পরেরটা আগে ইত্যাদি) করেছি। কিছু কিছু জায়গায় মামুলি দুই-একটা শব্দ যোগ-বিয়োগ করতে হয়েছে সাবলীলভাবে পড়ার স্বার্থে। এ সব পরিমার্জনা চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করি নি, অক্ষরবিন্যাস পাছে চিহ্ন-কণ্টকিত হয়ে পড়ে। কিন্তু, সর্বত্রই মুখের কথার বৈশিষ্ট্য যথাসাধ্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। মূল বক্তৃতাকে অবিকৃতভাবে হাজির করার বিশেষ তাগিদে পারত-পক্ষে শব্দ-বাক্য-বিন্যাসে হাত দিই নি। আপনি-তুমির গুরুচণ্ডালিও মেরামত করতে যাই নি। চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের ক্ষেত্রেও না।

শিক্ষার্থীদের সেলফোনে ধারণকৃত এ আলোচনার অনুলিপি-টুকরাগুলো প্রস্তুত করেছেন বাধন অধিকারী (১৩তম ব্যাচ এমএসএস ২০০৭–০৮ রোল ২৮২৬), পার্থ প্রতীম দাস (১৪তম ব্যাচ ৪র্থ বর্ষ ২০০৪–০৫ রোল ২৮৩০), আশরাফুজ্জামান (১৫তম ব্যাচ ৩য় বর্ষ ২০০৫–০৬ রোল ২৮৪৩), মেহেদী হাসান (১৫তম ব্যাচ ৩য় বর্ষ ২০০৫–০৬ রোল ২৮৪০), মো: শাহজালাল শ্যামল (১৫তম ব্যাচ ৩য় বর্ষ ২০০৫–০৬ রোল ২৮৫০) এবং মো: হাবিবুর রহমান (১৫তম ব্যাচ ৩য় বর্ষ ২০০৫–০৬ রোল ২৮২৩)। (কীভাবে যেন বাদ থেকে যাওয়ায় ২৫ মিনিটের একটা টুকরা-অনুলিপি পরে আমাকে তৈরি করে নিতে হয়েছে।) বাধন-পার্থ ছাড়া বাকিরা কম্পিউটার-ব্যবহারকারী হিসেবে নিতান্তই নতুন; অনুলিপি তৈরির কাজও তাঁদের এই প্রথম। অত্যন্ত ক্লান্তিকর এই কাজ এঁরা সবাই মিলে

করে না-দিলে এই অডিও-আলোচনা সম্ভবত আলোর মুখ দেখত না।

পুরোনো খবরের কাগজ ঘেঁটে তথ্যসূত্র বের করতে সাহায্য করেছেন অরুণাশিষ চক্রবর্ত্তী। এ কাজে সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী এবং সালমা রহমান শুভ্রাও সাহায্য করেছেন। একেবারে শেষ সময়ে বেশ কিছু কাগজপত্র আমার কাগজপত্রের গুদামে খুঁজে না-পাওয়ায় ফোন করে জ্বালাতন করেছি আলতাফ পারভেজ, সাজ্জাদ শরিফ, ব্রাত্য রাইসু, ফাহমিদুল হক, কাজী মামুন হায়দার, উদয় শঙ্কর বিশ্বাস, বাধন অধিকারী, মানিক হাসান এবং মুসতাইন জহিরকে। এঁদের সহযোগিতা ছিল উৎসাহব্যঞ্জক, আনন্দদায়ী। আলতাফ ভাই, জহির এবং উদয় বইপত্র পাঠিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। কোকিলের ছবিটা তুলেছেন মনিরা শরমিন (১৩তম ব্যাচ, এমএসএস ২০০৭–০৮, রোল নং ২৮২০)। এমনিতেই নতুন কালের আবাহনকারী হিসেবে কোকিলের তুলনা নেই, তদুপরি আমার কাছে (বিশেষত বৃহত্তর বাংলা দেশের) ইতিহাসের ধারায় অচেতন-অন্তর্জাত-অশনাক্তকৃত অ্যানার্কির (ব্যক্তির 'স্বাভাবিক স্বরাজপন্থা' ওরফে 'অন্তর্জাত অরাজপন্থা'র) জীবন্ত সমাজ-প্রকৃতিগত প্রতীক হয়ে উঠেছে এই ছবি, নানা কারণে। এ সব নিয়ে পরে কখনও বলা যাবে। আর, আমাকে সাথে নিয়ে চূড়ান্ত প্রুফ দেখার কাজটি দলবদ্ধভাবে সম্পাদন করেছেন ইচক দুয়েন্দে, সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী, মামুনুর রশীদ, মনিরা শরমিন এবং পার্থপ্রতীম দাস।

শ্রেণীকক্ষ-আলোচনার অডিও থেকে যাঁরা ট্রান্সক্রিপ্ট করেছেন, তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন; গাফিলতি হয়েছে আমার। যথাসময়ে পরিমার্জনা-সম্পাদনার কাজ শেষ করে তাঁদের সামনে পূর্ণাঙ্গ অনুলিপিটি হাজির করতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং ভবিষ্যতে অধিকতর সচেষ্ট হওয়া ছাড়া পথ খোলা নেই আমার জন্য। দ্বিতীয় পথ ভবিষ্যতের হাতে; আপাতত ক্ষমাপ্রার্থনাটুকু করি। নানা কিছুর পাশাপাশি *শিক্ষার্থীদের* প্রশ্নানুসন্ধিৎসার ওপরই সবচে বেশি নির্ভর করে শিক্ষকের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ। ক্লাসে-হাজির-থাকা শিক্ষার্থীদের কাছে এ ক্ষেত্রে আমার ঋণ নিরন্তর। এ ঋণ যত বাড়ে ততই মঙ্গল।

প্রকাশক, 'যেহেতু বর্ষা'র জনাব সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, রাত জেগে পাণ্ডুলিপি পড়েছেন অত্যন্ত যত্ন নিয়ে। আমাকে এক জায়গায় পরিবর্তনের জন্য পরামর্শও দিয়েছেন। তা মেনে আমি পরিমার্জনাও করেছি। প্রকাশকের কাছ থেকে বইয়ের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে এতটা আগ্রহ, যত্ন ও মনোযোগ আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

রচনাটি প্রবন্ধ হিসেবে পরিকল্পিত ও অনুলিখিত হয়েছিল *যোগাযোগ* পত্রিকার জন্য। তাতে এটা ছাপাও হয়েছে। পত্রিকাটার সমস্ত কাজ শেষ করে ফেলার পরও এই রচনাটির জন্য কয়েক মাস অপেক্ষা করেছেন *যোগাযোগ*-সম্পাদক ফাহমিদুল হক এবং আ-আল মামুন। এখন বই আকারে ছাপা হওয়ার সময় এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে, তাঁদের— বিশেষত ফাহমিদের—সুদীর্ঘ আন্তরিক অপেক্ষার নীরব চাপ না থাকলে আমার আরো অনেক কল্পনা-ফানুসের মতো এই গ্রন্থ-পরিকল্পনাও নিছক কল্পনাতেই থাকত।

এঁদের সকলের কাছে আমার নতজানু-শুকরিয়া। এরপরও ভুলত্রুটি যা আছে, তার দায় আমার। ভুলগুলো কেউ ধরিয়ে দিলে খুশি হবো: salimrezanewton@gmail.com।

স.র.ন.। পশ্চিমপাড়া, রাবি: ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১০

কথা-পুষ্পিকা

কথকতা: পাঁচ

টেলিভিশনের যুগে বিদ্রোহ: ডিজুস-জমানায় প্রতিরোধ-চেতনা

কথকতা: ছয়

ব্যারাক, বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্রোহ

কথকতা: সাত

সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ: সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন

সচেতন না-হওয়া পর্যন্ত কখনোই তারা বিদ্রোহ করবে না,
আর যতক্ষণ তারা বিদ্রোহ না-করছে ততক্ষণ তারা সচেতন হতে পারবে না।
জর্জ অরওয়েল, ১৯৫৪: ৬৫

কথকতা এক

সমাজ, রাজনীতি এবং বিদ্রোহ

তো, গতকালকে ২৫শে ফেব্রুয়ারি থেকে বিডিআরের যে-বিদ্রোহ আমরা দেখছি, সেইটাই আমাদের আজকের [২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখের] পড়ার-আলোচনার বিষয়—আমাদের এই কোর্সের অন্তর্ভুক্ত বিষয়—হিসেবে বিবেচনা করছি আমরা। এই কোর্সটা 'বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি'[১], তাই না? বাংলাদেশের সমাজের জন্য, বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য এর চেয়ে বড় ঘটনা গত অনেক বছর ধরেই ঘটে নি। [০০:০০:০০–০০:০০:৩৪]

১.১ গোটা বাহিনীর বিদ্রোহঃ অটুট সমঝোতা

একেবারে সারা দেশেরই, বলতে গেলে, গোটা যে-বিডিআর-বাহিনী আছে তার প্রায় সমস্ত জওয়ানই এই বিদ্রোহের সঙ্গে হয় প্রত্যক্ষভাবে, না-হয় মানসিকভাবে, যুক্ত। এবং আজকের দুপুর নাগাদ টেলিভিশনের খবরে আরো জানা গেল যে, সারা দেশের আরো বিভিন্ন জায়গাতে—বিডিআর যেখানে থাকে সেই জায়গাগুলোতে—নানান রকমের তৎপরতা তারা পরিচালনা করেছে। কোথাও অস্ত্র নিজেরা হাতে নিয়েছে, কোথাও নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছে। নানান ধরনের ঘটনা ঘটেছে। বাকিরা নির্লিপ্ত নয়। এবং এখনও পর্যন্ত আমরা গোটা বিডিআর-বাহিনীর ভেতরে বিদ্রোহের পক্ষে ছাড়া বিপক্ষের কারো অস্তিত্ব, বা আলাদা কোনো অবস্থান, বা নিজেদের মধ্যে দলাদলি—এগুলোর কোনো চিহ্ন দেখি নি। দলাদলি থাকলে, নিজেদের মধ্যে উদ্দেশ্যের এবং পন্থার প্রকৃত পার্থক্য থাকলে, সংকট-মুহূর্তেই সেই পার্থক্য উন্মোচিত হয় সবার আগে। খুব সহজেই যেকোনো সমঝোতা ভেঙে পড়ে—যখন সংকট তৈরী হয়। তো, এই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলা চরম সংকটময় একটা অবস্থার মধ্যেও যখন এই বাহিনীর নিজেদের মধ্যে কোনো সমঝোতার অভাব দেখা যাচ্ছে না, তখন আমাদের ধরে নিতে হচ্ছে যে, এই সমঝোতা খুবই গাঢ়। গভীর সমঝোতারই প্রকাশ ঘটছে।[২] সেই অর্থে বলছি যে, এত বড় একটা বাহিনী— তারা সবাই কোনো-না-

---

[১] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের বিএসএস (সম্মান) পার্ট–৩ এর এটি একটি কোর্স—'এমসিজে ৩০৬: বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি'।

[২] **আসামি হব তবু সাক্ষী হব না:** এ প্রসঙ্গে এখানে একটি দৈনিক পত্রিকা থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি—

> তদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, পিলখানায় বিদ্রোহের সময় প্রায় আড়াই হাজার অস্ত্র থেকে গুলি বর্ষণ করা হয়েছিল। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, যাঁরা অস্ত্র ধরেছেন, তাঁদের সবাইকে সিআইডির মামলার আসামি করা হবে। একটি অস্ত্রের জন্য একজন করে জওয়ানকে অভিযুক্ত করা হবে। কিন্তু তদন্তের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে কর্মকর্তারা জানান, এত জওয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ

কোনোভাবে বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত তাহলে: মানসিকভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে। ফলে, এইটা আমাদের সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। [০০:০১:০৮–০০:০২:১৫]

১.২ প্রশ্নটা স্রেফ 'সামরিক' নয়, সমাজ ও রাজনীতির প্রশ্নও বটে

বাংলাদেশের সব জায়গাতেই ক্যান্টনমেন্ট এবং আবাসিক/বেসামরিক এলাকা একটা আরেকটার ভিতর ঢুকে থাকে। যতই ক্যান্টনমেন্ট আলাদা এলাকা হোক, দেখা যায় যে, সিভিলিয়ানরা তার ভিতর দিয়ে যাওয়া-আসা করে। এবং সশস্ত্রবাহিনীর সামরিক নিবাসের আশেপাশে এবং ভেতরে নিজেদের আবাসিক এলাকায় নিজেদের মধ্যকার

প্রমাণ করার মতো পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করতে পারছেন না তাঁরা। গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বলতে আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিই তাঁদের ভরসা। কিন্তু এর মধ্যে পিলখানার বিডিআর বিদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া ২০ জওয়ান ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন আদালতে। নির্যাতনের মাধ্যমে জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে বলে তাঁরা দাবি করেছেন।

... সিআইডির কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন, এভাবে একজনের দেখাদেখি দলে দলে বিডিআর জওয়ানরা জবানবন্দি প্রত্যাহারের আবেদন করতে পারেন। তদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিআইডির এক কর্মকর্তা জানান, এ মামলায় সাক্ষি সবচেয়ে বড় সমস্যা। কেউ সাক্ষ্য দিতে চাইছেন না। পিলখানার অনেক জওয়ান সিআইডিকে বলেছেন, **তাঁরা আসামি হতে পারেন, কিন্তু সাক্ষী হবেন না।**" (কামরুল হাসান, ২০০৯-ক; মোটা হরফ বর্তমান প্রবন্ধকারের)

লক্ষ্যণীয়: জওয়ানরা বলছেন, তাঁরা এমনকি আসামি হতে রাজি আছেন, কিন্তু সাক্ষি হতে রাজি নন। তার মানে কি তাঁদেরকে এই মর্মে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে, যদি তোমরা সাক্ষ্য দাও, তাহলে তোমাদেরকে আসামি বানানো হবে না? কেবল এরকম একটা প্রস্তাবের পিঠেই কেউ বলতে পারেন যে, "তাঁরা আসামি হতে পারেন, কিন্তু সাক্ষি হবেন না।" যাই হোক, এত গ্রেপ্তার, রিম্যান্ড, জিজ্ঞাসাবাদ, নির্যাতন এবং আটকাবস্থায় 'মৃত্যু'—সকলই বৃথা গেছে প্রায়। বিদ্রোহের প্রশ্নে জওয়ানদের অটুট ঐক্যের এটাও একটা প্রমাণ বৈকি।

সিভিলিয়ান অংশ (স্ত্রী-পুত্র-স্বামী-কন্যা-পরিবার) এবং বাইরের সিভিলিয়ানদের অবস্থান থাকে। ফলে, এখানে ঘটনা এত বেশি 'সামরিক' না। এত বেশি 'সামরিক ঘটনা' না এইটা যে: আবাসিক লোকদের, বেসামরিক লোকদের চিন্তা করার কিছু নাই। ঘটনাটা সেরকম স্তরে নাই। খোদ রাজধানীতে, তার একেবারেই কেন্দ্রীয় একটা এলাকাতে, যেখানে কয়েক হাত পার হওয়া যাবে না সিভিলিয়ান এলাকা ছাড়া, সেখানে এই ঘটনা। গোটা বিডিআর-ক্যাম্প নিজেরাই এক অর্থে একটা সিভিলিয়ান স্থাপনার মতোই। তার মধ্য দিয়ে প্রতিদিন সিভিলিয়ানরা যাওয়া-আসা করে, এবং মেজর একটা যাতায়াত এর ভেতর দিয়ে হয়, এবং এই রাস্তাটুকু বন্ধ হলে ঢাকার এক অংশ আরেক অংশের সাথে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার মতো ঘটনা ঘটে। ফলে, সমাজের জন্য, সিভিলিয়ানদের জন্য, আমাদের সামরিক বাহিনীগুলোর মেম্বারদের জন্য, সকলের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা। গোটা সমাজের জন্য। রাজনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তো বটেই। [০০:০২:১৬–০০:০৩:৪৫]

১.৩ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা-সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মকানুনের নামই রাজনীতি।

এই কোর্স শুরু করার সময়, শুরুতেই, প্রথম একটা-দুইটা ক্লাসে বিস্তৃত আলোচনা করে আমরা দেখিয়েছি যে, 'সমাজ' এবং 'রাজনীতি' এই দুইটা মানুষের দুই রকমের সাংগঠনিক সত্তা বা যৌথ সত্তা, দুই রকমের যৌথতাজনিত সত্তা। দুটোই অনেকজন মানুষে মিলে গড়ে তোলে, একটা প্রক্রিয়ায়—যৌথ প্রক্রিয়ায়, সামাজিক প্রক্রিয়ায়, তাই না? [০০:০৩:৪৬–০০:০৪:৩০]

রাজনীতি হচ্ছে: সমাজের সমস্ত মানুষ কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে; কীভাবে পরিচালিত হবে। 'পরিচালিত' বললে 'নিয়ন্ত্রিত'র থেকে একটু ভালো বাংলা মনে হয়, একটু 'কম নিয়ন্ত্রণ' 'কম নিয়ন্ত্রণ' শোনায়, কিন্তু বাস্তবে, 'পরিচালিত' হওয়া মানেও কিন্তু কিছু লোক 'পরিচালনা' করবে, আর কিছু লোক 'পরিচালিত' হবে। তো, যারা 'পরিচালিত' হবে, তারা কোন কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা 'পরিচালিত' হবে, সেই সিদ্ধান্তগুলো তারা নিজেরা নেবে না। এ সিদ্ধান্তগুলো নেবে, যারা 'পরিচালক' তারা। তার মানে সমাজ (গোটা সমাজ) কেমন করে পরিচালিত হবে (মানে নিয়ন্ত্রিত হবে); নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-ক্ষমতা লাগবে সে-ক্ষমতা কার হাতে থাকবে, কতটুকু থাকবে; কীভাবে হবে ক্ষমতার প্রয়োগ, প্রয়োগের নিয়মকানুনগুলো কী হবে, অপপ্রয়োগ কোনটাকে বলব, অপপ্রয়োগ করলে তার জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া হবে— ইত্যাকার ক্ষমতা-বন্দোবস্তের নানান ধরনের বিধিবিধান-আইনকানুন, ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত-নিয়ম-নীতি-রীতি এইগুলো যা আছে, এবং এই সংক্রান্ত নানান ধরনের সংস্কৃতি, নানান ধরনের আচার-আচরণ— এইগুলো হচ্ছে রাজনীতির এলাকা। রাজনীতি হচ্ছে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সংক্রান্ত আলাপ। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা কে প্রয়োগ করবে, কার ওপর প্রয়োগ করবে, কার দ্বারা প্রয়োগ করবে, এই সংক্রান্ত নিয়মকানুন হচ্ছে রাজনীতি: এই সংক্রান্ত শিল্পকলা, এই সংক্রান্ত বিজ্ঞান, এই সংক্রান্ত প্রক্রিয়া, তার নাম হলো রাজনীতি। [০০:০৪:৩১–০০:০৬:৩১]

১.৪ সমাজ-নিয়ন্ত্রণের দুই কৌশল: বলপ্রয়োগ এবং সম্মতি উৎপাদন

রাজনীতিতে একেবারে গোড়ার জায়গাটা হচ্ছে বলপ্রয়োগ— একটা গোড়ার জায়গা। ণআরেকটা গোড়ার জায়গা হচ্ছে সম্মতি উৎপাদন। কিন্তু, যাঁরা নিয়ন্ত্রন করবেন, যাঁরা পরিচালনা করবেন সমাজকে, তাঁদের কথা সমাজ মেনে চলবে কেন? ধরে নেয়া হচ্ছে যে: মেনে না-চললে বলপ্রয়োগের সম্মুখীন হতে হবে। আইন আছে যে: লাল বাতি দেখলে তুমি থামবে, তুমি যদি না থাম তাহলে তোমাকে জেল-জুলুম-জরিমানা নানান ধরনের বলপ্রয়োগের মুখোমুখি হতে হবে। তার মানে এখানে 'আইন' আছে। রাজনীতি পরিচালিত হবে আইন দ্বারা: এটা হচ্ছে অনুমান। রাজনীতিতে যাঁরা নিয়ন্ত্রক, তাঁদের হাতে বলপ্রয়োগ করার মতো ক্ষমতা, বাহিনী, কম্যান্ড—তাঁদের হাতেই সব কিছু। বলপ্রয়োগ ছাড়া কোনো রাজনীতি নাই। ক্ষমতার আলাপ ছাড়া কোনো রাজনীতি নাই। রাজনীতি মানে হলো রাজাদের আলাপ। রাজাদের আলাপ মানেই হচ্ছে, মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা, পরিচালনা করা: হয় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, না-হয় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে। [০০:০৬:৩২–০০:০৭:৩৯]

১.৫ শাস্ত্র এবং ধর্ম: যথাক্রমে রাজনীতি ও সমাজের এলাকা

এই যে বুঝানো-সুঝানো—এইটা হচ্ছে শাস্ত্র। চিরায়ত কাল ধরে এই কাজ করেছে শাস্ত্র— ধর্মের নামে। ধর্ম আর শাস্ত্র কিন্তু এক জিনিস না। ধর্ম হচ্ছে সমাজের তৈরি করা একটা জিনিস। শাস্ত্র হচ্ছে রাজনীতিওয়ালাদের, নিয়ন্ত্রকদের, পরিচালকদের, কর্তৃত্বের, কর্তৃপক্ষের তৈরি করা বিধিবিধান। আর, আল্লার সঙ্গে, চিরায়ত সত্তার সঙ্গে, সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে, মানুষের সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক—এইটা খোলা, এইটা 'গণতান্ত্রিক'[৩], এইটা ওপেন। এখানে কোনো কর্তৃত্ব নাই। আল্লা-ভগবান নিজে এসেও কর্তৃত্ব করেন না। নবী-অবতাররা কেউ কর্তৃ

---

[৩] সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক 'গণতান্ত্রিক' (দ্রষ্টব্য: ১.৫ অংশ) কথাটার বিশেষ অর্থ মনোযোগ দাবি করে। এখানে 'গণতান্ত্রিক' বলতে রাজনৈতিক নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো কিছু বোঝানো হচ্ছে না, বা পাঁচ বছরে একবার ভোটাভুটির কথা বলা হচ্ছে না, যদিও লোকেরা আজকাল (মানে রাজনৈতিক দলভিত্তিক পার্লামেন্টারি/প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের এই যুগে) 'গণতান্ত্রিক' বলতে এসবই বোঝেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, 'গণতান্ত্রিক' চেতনার সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্বেচ্ছায়, স্বভাবিকভাবে, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এবং জবরদস্তিহীনতার পাটাতনে। আমি বলতে চাইছি: আলাহ্পাক এমন কোনো কর্তৃপক্ষ নন, যার সাথে আমার সম্পর্ক গোলামির। আলার সাথে আমার সম্পর্ক পারস্পরিক সমগ্রতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটা সম্পর্ক। এই সম্পর্ক ভালোবাসার। জোরজবরদস্তির কোনো সম্পর্ক এটা আদৌ নয়। ধর্ম আমাকে জোর করে ঈশ্বরের প্রতি ঈমান কবুল করায় নি। বিচিত্র সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-বিদ্যায়তনিক-দার্শনিক রসায়নে জারিত হয়ে অন্ধবিশ্বাস, অন্ধ-অবিশ্বাস এবং আরো সব গলিপথজঙ্গল পার হয়ে আমি নিজে আমার নিজের মতো করে ধর্ম-আলা-আধ্যাত্মিকতার ধারণা অর্জন করেছি। এটাই ধর্মের পথ। মানুষের ধর্মের পথ। স্বাধীনতার পথ। এটা সমাজেরও পথ বৈকি। ধর্ম-সমাজ-মনুষ্যত্বের এই পথ গণতান্ত্রিক। রাজনীতির পথ কখনোই এরকম নয়। রাজনীতির পথ স্বভাবতই অগণতান্ত্রিক। রাজনীতির পথই হলো গিয়ে শাস্ত্রের পথ। ধর্মের পথ মানে মনুষ্য-স্বভাবের পথ। "নবীরা হচ্ছেন মানুষের কতকগুলি মৌল প্রকৃতি ও মৌল মূল্যবোধের প্রতীক। ... মৌল মূল্যবোধ—যার ওপর সমাজ ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা, নবীরা তারই প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা ...। আর এসব সর্বযুগেই মানুষের মনুষ্যত্বের অঙ্গ বলে স্বীকৃত।" (আবুল ফজল ২০০৫: ৬২)

ত্ব করার জন্য বিখ্যাত না।[৪] নবী-অবতাররা সবাই জনগণের অংশ হয়ে ওঠার জন্য বিখ্যাত, জনগনের সাথে স্বাভাবিক, সহজ, সুন্দর সম্পর্ক থাকার জন্য বিখ্যাত। [তাঁরা রাজা নন, শাসক নন—হেদায়েতকারী, সুপথপ্রদর্শনকারী, সত্যপ্রচারকারী।] তাঁরা জনগণেরই সাধারণ মেম্বার হিসেবে গড়ে উঠেছেন, গড়ে ওঠেন। তাঁরা কিন্তু জনগণকে কর্তৃত্ব করে, হুকুম করে এবং সেই হুকুম না-মানলে বলপ্রয়োগ করার মাধ্যমে পরিচালনা করেন নাই। ফলে, গোটা ধর্মের এলাকা, নবী-রসুলের এলাকা, আল্লার-খোদার এলাকা, ভগবান-অবতারের এলাকা—এই এলাকার নেচার এক রকম। এইটা স্বাধীন একটা জায়গা।[৫] এখানে মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের খেয়াল খুশি নীতি রীতি চিন্তা বিবেক বুদ্ধি যুক্তি বিশ্লেষণ এগুলোর মাধ্যমে প্রকৃতি, মানুষ এবং পরম মানুষ (পরম আত্মা বা পরম ভাব) বা পরম সৃষ্টিকর্তা—এরকম কোনো একটা শক্তির সঙ্গে, বা অনুমানের সঙ্গে, বা ধারণার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে।[৬] এর নাম হচ্ছে ধর্ম। ['ধর্মই সমাজ' (এমিলি ডুর্খেইম, ১৯৬৪)] [০০: ০৭:৪০–০০:০৯:১৪]

শাস্ত্র হচ্ছে ধর্মের আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত কতকগুলো কঠোর বিধিবিধান, যে-বিধিবিধান মেনে না চললে তুমি 'বিধর্মী', তুমি 'অধর্মী', তুমি ধর্মের বাইরে, তুমি একঘরে, তুমি বাতিল। তার মানেই বলপ্রয়োগ। কিংবা আরো প্রত্যক্ষভাবে বললে: জেল-জুলুম-জরিমানা। নানান ধরনের বলপ্রয়োগমূলক পদ্ধতি। এটা শাস্ত্রের পদ্ধতি। [০০:০৯:১৫–০০:০৯:৩৯]

আর, ধর্মের পদ্ধতি হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্ক, পারস্পরিক সমঝোতা, পারস্পরিক ভালোবাসা, পারস্পরিক লেনদেন ও পারস্পরিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে এবং পরস্পর-সম্মতির ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার একটা প্রক্রিয়া।[৭] এবং অসম্মতি থাকলেও সেটা

---

[৪] "নবীরা গোষ্ঠীপতি যেমন নন, তেমনি নন রাষ্ট্রপতিও। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) শুধু কোরেশের বা আরবের নবী ছিলেন না।" (আবুল ফজল ২০০৫: ৫৯)

[৫] "মানুষের একটা সার্বভৌম এলাকা আছে—দেশ, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র ও জাতির ঊর্ধ্বে তার স্থান। ধর্ম, সত্য, মানবতা আর তার প্রতিভূ নবী বা মহাপুরুষেরা হচ্ছেন সেই এলাকার বাসিন্দা।" "নবীরা অখণ্ড সত্যের প্রতীক। রাষ্ট্রকে খণ্ড খণ্ড করা যায় কিন্তু নবীকে তা করা যায় না।" "নবীরা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নন—তাঁরা সত্যের প্রতিনিধি, যে সত্যের ওপর সব মানুষের রয়েছে সমান অধিকার।" (আবুল ফজল ২০০৫: ৬১-৬২)

[৬] কার্ল মার্কসের অন্তত *আংশিক* উদ্ধৃতি আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে: "ধর্মীয় ক্লেশ হল একই বাস্তব ক্লেশের অভিব্যক্তি এবং বাস্তব ক্লেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। ধর্ম হল নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, ঠিক যেমন সেটা হলো আত্মাহীন পরিবেশের আত্মা। ... তাই ধর্মের সমালোচনা হল ধর্ম যার জ্যোতির্মণ্ডল সেই অশ্রু উপত্যকার সমালোচনার সূত্রপাত। ... এইভাবে স্বর্গের সমালোচনা মর্ত্যের সমালোচনায় পরিণত হয়, ধর্মের সমালোচনা পরিণত হয় আইনের সমালোচনায়, আর ব্রহ্মবিদ্যার সমালোচনা [পর্যালোচনা] পরিণত হয় রাজনীতির সমালোচনায়।" (কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, ১৯৯৪: ৪০)

[৭] "রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বিরোধের ওপর, মানুষ ও দেশকে বিভক্ত করে খণ্ড খণ্ড করে দেখার ওপর। রাষ্ট্রের তথা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তার সৃষ্টি করে তার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে পার্থক্য, তার লক্ষ্য মিল নয়, স্বাতন্ত্র্য। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই স্বতন্ত্র প্রতীক অর্থাৎ স্বতন্ত্র জাতীয় পতাকা। অন্যদিকে নবীদের শিক্ষা ও লক্ষ্য হচ্ছে ঐক্য, বিশ্বমানবতা, বিশ্বভাতৃত্ব, সব রকম ভেদ-বৈষম্য দূর করে সাম্য ও মৈত্রী

মেনে নেওয়া: 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে, আমাদের ধর্ম আমাদের কাছে'[৮]। কিংবা, যদি আমি দাওয়াত দিই আর সেই দাওয়াত কেউ কবুল না-করে, তবে তার জন্য তাদের ওপর শাস্তি প্রয়োগ করার দায়িত্ব আমার না। যে এই দাওয়াত গ্রহণ করে না, যে সত্যের পথে আসে না, তাকে কী শাস্তি দিতে হবে, তা দেওয়ার জন্য স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আছেন। ধর্মপালন না-করার জন্য, কেন তুমি প্রতিদিন আল্লার নাম নাও নি, প্রতিদিন পূজা কর নি, তার জন্য কিন্তু সৃষ্টিকর্তা নিজে এসে, কোনো অবতার নিজে এসে শাস্তি প্রয়োগ করেন না। যদি করতেন, তাহলে সেটা হতো শাস্ত্রের জায়গা। [০০:০৯:৪০–০০:১০:২৩]

[শাস্ত্রীয় দীক্ষায়ন-প্রচারণাজনিত অভ্যাসের কারণে অনেক সময় আমরা শাস্ত্রকেই 'ধর্ম' বলে ডাকি বৈকি। সেই ডাক এত প্রবল যে, উপেক্ষাযোগ্যও নয়। তথাপি, এই ডাক গ্রহণযোগ্য নয়। চাইলে শাস্ত্রকে বড়জোর 'শাস্ত্রধর্ম' বলে ডাকা যেতে পারে। ধর্ম সেক্ষেত্রে দুই প্রকার দাঁড়ায়: মানবধর্ম বা আল্লার ধর্ম এবং শাস্ত্রধর্ম তথা রাজার ধর্ম বা রাজধর্ম। আমরা সাধারণত খেয়াল করি না: ধর্ম আসলে কল্পনা-চিন্তা-দর্শন-নীতি-আধ্যাত্মিকতা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিশ্লেষণের আদিতম এলাকা। এটা মানুষের স্বভাবের তথা মনুষ্য-ধর্ম সংক্রান্ত এবং (মানুষ-বহির্ভূত অর্থে) প্রকৃতি-ধর্ম সংক্রান্ত উপলব্ধি-অনুমান-আবিষ্কারের) এলাকা। এটা মনুষ্যপ্রকৃতির সাথে মা-প্রকৃতির সম্পর্কের এলাকা। মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্কের এলাকা।]

১.৬ আইন ও রাজনীতি শুধু বলপ্রয়োগের জোরে চলতে পারে না

মানে, কর্তৃপক্ষ যে তাঁদের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন, তাঁরা যে পরিচালনা করেন মানুষকে এবং জনগণকে, তাঁরা যে নিয়ন্ত্রণ করেন, এটার উপায় হচ্ছে: হয় বলপ্রয়োগ, না-হয় শাস্ত্র। [বলপ্রয়োগ এবং শাস্ত্র সবসময়ই রাধাগোবিন্দের যুগলমূর্তি রূপে বিরাজ করে। বলপ্রয়োগের বৈধতা বিধান করাই শাস্ত্রের সর্বপ্রধান কাজ।] শাস্ত্র মানে ফুসলানো, শাস্ত্র মানে বুঝানো-সুঝানো, শাস্ত্র মানে সম্মতি উৎপাদন করা: যেন এই শাস্ত্রটাকে এবং এই শাস্ত্রের পেছনে থাকা কর্তৃপক্ষকে জনসাধারণ মেনে নেয়; যেন তারা মনে করে, এতেই মঙ্গল; যেন তারা অন্তর থেকেই মেনে নেয়; যেন তারা একমত হয় সত্যিকারের। [০০:১০:২৪–০০:১০:৫৩]

এ রকম সত্যিকারের ঐকমত্য জনসাধারণের মধ্যে যদি না-থাকে, তাহলে কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকে থাকতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকে থাকার পক্ষে তখন একমাত্র উপায় থাকে বলপ্রয়োগ করা। কিন্তু, শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ করে কোটি কোটি মানুষের একটা সমাজকে, বা একটা জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করা, হুকুম অনুসারে

প্রতিষ্ঠা–মানুষের মন থেকে বিরোধের বিষ উৎপাটন করে একটা উচ্চতর ও মহত্তর জীবনবোধের ওপর সব মানুষকে সম্মিলিত করা।" (আবুল ফজল ২০০৫: ৫৯)

[৮] "বলুন, হে কাফেরকুল, আমি এবাদত করি না তোমরা যার এবাদত কর। এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি এবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর। তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।" (আল কোরান, ১৪১৩ হিজরি: ১৪৭৬–১৪৮০)

পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। জনগণ নিজে যদি পরিচালিত হতে চায়, তবেই আইন চলতে পারে। আইন শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের জোরে চলে না। [০০:১০:৫৪–০০:১১:২২]

তাহলে আইন আর কর্তৃত্ব চলে দুইটা শক্তিতে। [এক] গোটা সমাজ যদি শাস্ত্রের মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে, লেখাপড়ার মাধ্যমে, নানান আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গড়ে তোলা কতকগুলো ন্যূনতম নীতি, ন্যূনতম সিদ্ধান্ত মেনে চলে; এবং [দুই] গোটা সমাজ যদি আইনের দ্বারা (রাজনীতি সংক্রান্ত নিয়মকানুনের দ্বারা) নির্বাচিত বা গড়ে ওঠা রাজনৈতিক শক্তির প্রতি আস্থা রাখে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এরা আমাদেরকে পরিচালিত করুক— তবেই জনগণকে পরিচালনা করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের পথ খোলা থাকে। শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ দিয়ে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ/পরিচালনা করা যায় না। [০০:১১:২৩–০০:১২:০৬]

১.৭ সমাজ বেসামরিক এলাকা, কিন্তু সমাজ বলপ্রয়োগও করে

অন্যদিকে, সমাজ হচ্ছে একটা বেসামরিক এলাকা (সাধারণভাবে)। এই বেসামরিক এলাকা কিন্তু মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রক্রিয়াই পরিচালনা করে। সন্তান জন্মদান, সন্তান লালনপালন, সন্তানকে শিক্ষিত করা, সন্তানকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য, আবাসন, খাওয়া-দাওয়া, চিকিৎসা, সব ধরনের তাদের মনোরঞ্জন, তাদের আত্মার জন্য যা যা প্রয়োজন, তাদের সংস্কৃতির জন্য যা যা প্রয়োজন, সব ধরনের আয়োজন—এগুলো সমাজ করে।[৯] এগুলো হচ্ছে সামাজিক প্রক্রিয়া। [০০:১৩:০৭–০০:১৩:৪২]

সামাজিক প্রক্রিয়ার একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে: এইটা সাধারণত বেসামরিক প্রক্রিয়া। কিন্তু, কখনো-কখনো সমাজ নিজেও অস্ত্র ধারণ করে, বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় [যেমন: মুক্তিযুদ্ধ, গণঅভ্যুত্থান, গণপিটুনি দিয়ে 'গরুচোর' মেরে ফেলা কিংবা খেজুরের কাঁটা দিয়ে ডাকাতের চোখ তুলে নেওয়া]। প্রচলিত সামরিক বাহিনীগুলো, প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলো, প্রচলিত নির্বাচন, প্রচলিত সংসদ এবং প্রচলিত নির্বাহী সংস্থাকে (মানে: থানা-পুলিশ-ডিসি-এসপি-রাষ্ট্রপতি এইগুলোকে, এই সমস্ত নিয়ম-নীতি-সংস্থাগুলোকে) অস্বীকার করে কখনো-কখনো সমাজ, মানে জনসাধারণ, অস্ত্র ধারণ করে। সেটা খুব কালেভদ্রে ঘটে। জনসাধারণের বেশিরভাগ অংশ অস্ত্র ধারণ করছে কিংবা অস্ত্রধারণের পক্ষে একমত পোষণ করছে— এ রকম ঘটনা একটা সমাজের জীবনে, ইতিহাসে খুব কম ঘটে। যখন ঘটে সেটা অন্য প্রসঙ্গ, সেটা ব্যতিক্রম। কিন্তু, এ ছাড়া সারা জীবন ধরে, সারা বছর ধরে সমাজ নিরস্ত্র এলাকা,

---

[৯] **রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তা**: কৃষি বাণিজ্য চিকিৎসা আবাসন শিক্ষা—রাষ্ট্রের এ সব বেসামরিক কর্মকাণ্ডের সাথে বৃহত্তর সমাজ-সংশ্লিষ্ট মানুষজনই বেশি জড়িত। রাষ্ট্রের আইন এবং আমলাতান্ত্রিক কর্মপ্রণালীর বিধিবিধান মেনে এসব কাজ পরিচালিত হলেও এগুলো রাষ্ট্রের সামাজিক সত্তার অংশ। অন্যদিকে, আইনপ্রণয়ন, ক্ষমতাবিন্যাস, সমাজ-নিয়ন্ত্রণ ও সামরিক বিষয়াদি রাষ্ট্রের রাজ নৈতিক সত্তার অংশ। রাষ্ট্রের সামাজিক সত্তার কাজগুলো (যেমন কৃষি বা শিক্ষা) প্রাক-রাষ্ট্র সমাজ যুগ-যুগ ধরেই সম্পাদন করে আসছে কোনো কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের অপেক্ষায় বসে না-থেকে।

বেসামরিক এলাকা। [০০:১৩:৪৩–০০:১৪:৪১]

১.৮ 'বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি' কোর্স: বিদ্রোহ-পর্যালোচনার ক্লাসরুম-কর্তব্য

আমাদের এই কোর্সের কাজ হচ্ছে একদিকে সমাজ নিয়ে আলাপ করা—তার অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, প্রশাসনিক, সামরিক সব ধরনের দিক নিয়ে আলাপ করা; আরেক দিকে, রাজনীতি নিয়ে আলাপ করা, মানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলাপ করা। [০০:১৪:৪২–০০:১৪:৫৮]

রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে যাঁরা নেতা হন, কর্মকর্তা হন, যাঁরা উচ্চপদস্থ হন, এঁরা 'ন্যাচারালি' সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। সমাজের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেক দিন দেখা হয় না। মন্ত্রীর সঙ্গে, প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে বাজার করতে গেলেও দেখা হয় না। স্কুলে বাচ্চা নিয়ে গেলে আমি দেখি না যে, মন্ত্রী বা এলাকার এমপি বা ভিসি তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে এসেছেন: এগুলো হয় না। তাঁরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন থাকেন। তাঁরা সমাজের বলপ্রয়োগকারী অংশে পরিণত হন। এখন, যদি তাঁদের বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে এই বলপ্রয়োগ সীমিত হয় (যথাসম্ভব সীমিত হয়), এবং যদি এই বলপ্রয়োগ যতটুকু না-করলেই না ততটুকুই (উপযুক্ত বিবেচনাসম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত) হয়, তখন সমাজের জন্য মঙ্গল হয়। এখনও পর্যন্ত আমাদের বা পৃথিবীর বেশিরভাগ অংশের সমাজ (সমাজ মানে সমাজের মেম্বাররা—জনসাধারণ) এই ধরনের একটা পদ্ধতিকে যেকোনো কারণেই হোক মেনে নিয়েছে।[১০] [০০:১৪:৫৯– ০০:১৬:০২]

তার মানে: আমরা সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে যখন আলাপ করি, তখন বিডিআর-বিদ্রোহ সমাজের জন্য বিশাল একটা সামাজিক ঘটনা। এই বিডিআরের জওয়ানরা প্রায় সবাই বাংলাদেশের কৃষক শ্রেণীর সন্তান। প্রায় সবাই বাংলাদেশের অতিরিক্ত নিম্ন আয়ের মানুষের সন্তান। বড়লোক-দরিদ্র যদি ভাগ করি, তাহলে বিডিআররা পারিবারিকভাবে দরিদ্র অংশের প্রতিনিধি, এবং সমাজের বিপুল অংশের প্রতিনিধি। তাদের নিজেদের বাহিনীর মেম্বার-সংখ্যা বিপুল, এবং এদের সাথে জড়িত পরিবার-পরিজন-আত্মীয়-স্বজন মিলে বাংলাদেশের মেজরিটি মানুষের ব্যাপক অংশ এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তার মানে বিশাল সামাজিক ঘটনা। [০০:১৬:০৩–০০:১৬:৫১]

একই সঙ্গে, এটা বিশাল একটা রাজনৈতিক ঘটনাও। [০০:১৬:৫১–০০:১৬:৫৫]

[প্রথমত] বিডিআরের বিদ্রোহ হচ্ছে বলপ্রয়োগের এলাকা। রাষ্ট্র এবং তার রাজ নৈতিক সংস্থাগুলো কী কী ভাবে বলপ্রয়োগ করবে; কোন কোন বাহিনীর মাধ্যমে, কোন কোন লোকজনের মাধ্যমে বলপ্রয়োগ করবে; কারা বলপ্রয়োগের অধিকারী হবে, বলপ্রয়োগের হুকুম কে দেবে, না-দেবে তার সঙ্গে যেমন সংসদ নির্বাচন-কমিশন আমলাতন্ত্র নির্বাহী সংস্থা রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া জড়িত, তেমনই একই সঙ্গে রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীগুলোও জড়িত; নানান ধরনের বন্দুকধারী (বৈধ

---

[১০] কর্তৃত্বের আদি উৎপত্তি সংক্রান্ত কথাবার্তার জন্য দেখুন: কলিম খান, ১৯৯৫; Bakunin, 1871; Bakunin, 1950; Bakunin, 1953; মিখাইল বাকুনিন, ২০০৭; Kropotkin, 1927; Kropotkin, 1992; Russel, 1992।

বলপ্রয়োগের অধিকারী) বাহিনীগুলোও জড়িত। এইগুলাও রাজনীতিরই অংশ। [০০:১২:০৭–০০:১৩:০৬]

[দ্বিতীয়ত] রাষ্ট্র যেভাবে পরিচালিত হওয়ার কথা, রাষ্ট্রের বাহিনীগুলো যেভাবে পরিচালিত হওয়ার কথা, রাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্র-অস্ত্রাগার-বন্দুক, ‘চেইন অফ কমান্ড’, হুকুমদারি এগুলা যেভাবে চলার কথা, সেইটা বিডিআরের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে, এটা একটা বড় রাজনৈতিক ঘটনা: রাষ্ট্র-পরিচালনা সংক্রান্ত একটা বড় ঘটনা। [০০:১৬:৫৫–০০:১৭:২৬]

ফলে, এই উভয় দিক থেকে বিডিআর-বিদ্রোহ ‘বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি’ নামের এই কোর্সের মধ্যে পড়ে। [০০:১৭:২৬–০০:১৭:৩৮]

সামাজিক বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে, এ সমাজের সদস্য হিসাবে, সচেতন মানুষ হিসাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়-পরিবারের সদস্য হিসাবে আমাদের কাজ হচ্ছে, সমাজের ভালো মন্দ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, গবেষণা করা। এই সব বিচারেই এই বিডিআর-বিদ্রোহ নিয়ে আমরা তাহলে বিশ্লেষণ করার কর্তব্য বোধ করতে পারি। এই বোধ করাটা স্বাভাবিক। [কেননা জ্ঞান উৎপাদন করার কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের। নীতি নির্ধারকদের সামনে, জনগণের সামনে সমাজের পরিস্থিতি তুলে ধরার কর্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের। এ জন্যই সমাজের সদস্যরা রাষ্ট্রের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দেয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে।] [০০:১৭:৩৯–০০:১৮:২১]

ইতিহাস-পড়া যেকোনো মানুষ জানেন, অবাধ্যতা মানুষের মৌলিক গুণ।
অবাধ্যতার মাধ্যমেই প্রগতি অর্জিত হয়েছে। অবাধ্যতার মাধ্যমে এবং বিদ্রোহের মাধ্যমে।

অস্কার ওয়াইল্ড, ১৮৯৫

কথকতা দুই

আলোচনার পদ্ধতি: এলিটত্ব বনাম তাৎক্ষণিকতা ও কমনসেন্স

এত বড় একটা ঘটনা যখন মাত্র গতকালকে ঘটা শুরু হয়েছে, তখন এইটা নিয়ে এত তাৎক্ষণিকভাবে উপযুক্ত বিশ্লেষণ হাজির করা সহজ না। সম্ভবত খুবই কঠিন—প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। কিন্তু, এই মুহূর্তেই—যেমন সরকারকেও বটে, যেমন বিডিআরের সব সদস্যকেও বটে, তেমনি গোটা দেশের সমস্ত মানুষকেও বটে—বুঝতে হচ্ছে, বোঝার চেষ্টা করতে হচ্ছে যে: কী ঘটেছে, কেন ঘটেছে, কীভাবে ঘটেছে, এর পরিণাম কী, কী করলে এটা না ঘটতে পারত, ভবিষ্যতে কী করলে এটা না ঘটতে পারে, যা ঘটেছে তার জন্য এখন আমাদের করণীয় কী। গোটা সমাজের যা করা উচিত সেটাই রাষ্ট্র করবে—এটাই এখন সমাজের চাওয়া। [০০:১৮:২২–০০:১৯:১৭]

২.১ সংকট গোটা সমাজের: সিদ্ধান্ত কতিপয়ের

কিন্তু, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, গোটা সমস্যাটা সমাধান করার জন্য এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ-আলোচনা করে, বিশ্লেষণ করে বোঝার দায়িত্বটা যেন সমাজের অল্প কিছু লোকের। যাঁরা টেলিভিশনে টক-শো করেন, যাঁরা পত্রিকা করেন, যাঁরা সাংবাদিক, যাঁরা শিক্ষিত লোক, যাঁরা রাজনৈতিক দল, যাঁরা পার্লামেন্ট এবং যাঁরা সরকার: যেন এটা এঁদেরই দায়িত্ব, যেন শুধু এঁরা বিশ্লেষণ করে বুঝলেই চলবে। [০০:১৯:১৮–০০:১৯:৪৯]

কিন্তু, প্রসঙ্গটা এমন, এত বড়, এত গুরুত্বপূর্ণ যে: গোটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষই এটা বুঝতে চায়, এবং তারা বোঝার চেষ্টা করছে এই মুহূর্তে। যার কাছে যতটুকু সুযোগ আছে, সেই অনুসারে তথ্য সংগ্রহ করে, পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে, সমস্ত মানুষ আজকে সারা বাংলাদেশে আলোচনায় লিপ্ত যে: আমাদের দেশে কী হচ্ছে, আমাদের সমাজে কী হচ্ছে। কিন্তু, মিডিয়াতে, পার্লামেন্টে, সরকারের আচরণে (এইগুলিই হচ্ছে এদের জন্য 'স্বাভাবিক আচরণ'; আমাদের সমাজ এভাবেই দেখতে অভ্যস্ত) শুরুতেই আমাদের মনে, আমার মনে এই খটকা লাগে যে, এই যে সারা দেশের লোকের এত আন্তরিক আগ্রহ, এই উৎকণ্ঠা—এর কোনো স্বীকৃতি রাষ্ট্রের দিক থেকে নাই, মিডিয়ার দিক থেকে নাই। [০০:১৯:৫০–০০:২০:৪০]

এখনও পর্যন্ত আমরা দেখি নি, সারা বাংলাদেশের মানুষের—সাধারণ মানুষের—কাছ থেকে মিডিয়া হাজারে-হাজারে সাক্ষাৎকার নিচ্ছে, বা এমন কোনো কিছু দেখি নি যা থেকে বোঝা যায় যে, সমস্ত সাধারণ মানুষ কী ভাবছে সেটা জানার আগ্রহ মিডিয়ার আছে, বা মানুষের সেই ভাবনাকে, উৎকণ্ঠাকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগ্রহ

মিডিয়ার আছে।[১১] অথচ এই সমস্যার সমাধান ভালো কী হতে পারে—এই ব্যাপারে সারা দেশের মানুষ মতামত দিতে পারে। মতামত দেওয়ার জন্য অনেক যান্ত্রিক সুযোগ, প্রযুক্তি আমাদের হাতে আছে। চাইলে আমরা খুব দ্রুত বাংলাদেশের হাজার-হাজার লোকের মতামত নিতে পারি। [০০:২০:৪১–০০:২১:১৫]

কিন্তু, এই দিকে আমাদের কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। কেননা, আমাদের গোটা রাষ্ট্র এবং সমাজের গড়ন-কাঠামো, তার প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়োজন, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি—অর্থাৎ সামগ্রিক সামাজিক যে-সম্মতির ভিত্তিতে সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে, তার মধ্যে এইরকম চিন্তা নাই যে, গোটা দেশ সমাজ সবাই উৎকণ্ঠিত, সবাই এর একটা ভালো সমাধান করতে চায়। সংকট গোটা দেশের; সিদ্ধান্ত অল্প-সামান্য কিছু লোকের।[১২] [০০:২১:১৬– ০০:২২:০৮]

২.২ এলিট-পরিস্থিতি: সাধারণ মানুষের ভূমিকা পালনের উপায় নেই

এটা ঠিক যে, গোটা দেশের মানুষ তো আর পিলখানায় যেয়ে বিডিআরদের সাথে আলাপ করতে পারবে না। সেই দিক থেকে বলতে গেলে, সুনির্দিষ্ট কিছু লোক সুনির্দিষ্ট কাজগুলো করবেন। সমস্যা সমাধান করার জন্য *স্পেসিফিক* সিদ্ধান্ত তাঁরা নেবেন এবং বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু তাদেরকে তো বুঝতে হবে যে, গোটা দেশের মানুষ এক্ষেত্রে কী চায়—কী পথ চায়। তারা কী চায়, এর একটা রক্তাক্ত সমাধান হোক? তারা কি মনে করে, এটা একটা বিশৃঙ্খলা মাত্র? তারা কি মনে করে যে, এটা বিডিআরের সদস্যদের নিয়ম-নীতি থেকে দূরে চলে যাওয়া, এটা তাদের স্খলন, এটা তারা অন্যায় করেছে, এবং এইটার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া উচিত? নাকি তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এর একটা সমাধান চায়? নাকি তারা এই বিদ্রোহকে ও এই বিদ্রোহের পেছনের কারণগুলোকে শনাক্ত করতে চায়, বুঝতে চায়? নাকি তারা এ রকম ভাবে: এইরকম একটা বিদ্রোহ যে হচ্ছে, তার পেছনে নিশ্চয়ই খুব বড় কারণ আছে—তা ছাড়া এত সুশৃঙ্খল একটা বাহিনী (দীর্ঘ কাল ধরে যারা এ ধরনের বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত নয়) কেন হঠাৎ করে একদিন এত বড় বিদ্রোহ করবে? সমস্যা সমাধানের মূল নীতির প্রশ্নেই বা জনগণ কী মনে করে? জনগণের এই চিন্তা-ভাবনা-সিদ্ধান্ত জানার, বা এই সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে জনগণকে কেমন করে কাজে লাগানো যায়, সেইটা জানার মতো কোনো উদ্যোগ আমরা দেখছি না। [০০:২২:০৯–০০:২৩:৩৫]

---

[১১] এটা 'সর্বাধিক প্রচারিত' কর্পোরেট মিডিয়ার একটা স্বভাব যে: মিডিয়া শুনতে চায় না, শুধু বলতে চায়। 'শাদা-তালিকাভূক্ত' যেসব বুদ্ধিজীবীর 'মত' মিডিয়ায় ছাপা হয়, মিডিয়ার দরবারে তাঁরা মহাসম্মানিত মেহমান, একেবারে তাঁদের নিজেদের লোক। ঐসব 'মত' তাই আসলে মিডিয়ারই নিজের মত।

[১২] এটা খুবই মজার বিষয় যে: ছোট একটা রাজনৈতিক গোষ্ঠীই সবসময় পুরো সমাজের হয়ে যাবতীয় মূলনীতিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন, তাঁরাই সেসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের স্বার্থে তাঁরাই বলপ্রয়োগের হুকুম দেন। বাকি কোটি-কোটি মানুষ নিজেদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরানোর লোক বেছে নেওয়ার জন্য পাঁচ বছর পর-পর ভোট দেন।

আমরা খুবই এলিট একটা পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি; এবং বলেছি: এটা আমাদের সমাজের স্বাভাবিক গড়নের মধ্যে পড়ে। যে-সম্মতির ভিত্তিতে সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে, তার পরিণামে এখনও পর্যন্ত মানুষের চেতনা, মানুষের চিন্তাভাবনা, চাওয়া-পাওয়া ঐ ধরনের জায়গাতেই আটকে আছে যে: *কিছু* লোক, তারা এটার সমাধান করবে, তারা ভালো সমাধান করুক, এবং তারা কোনো-না কোনোভাবে জেনে নিক যে, আমরা জনগণ কী চাচ্ছি। [০০:২৩:৩৬–০০:২৪:০০]

এবার তাহলে আমরা যখন বিদ্রোহের এই ঘটনাটার নানান ধরনের দিক নিয়ে আলোচনা করব, তখন খুব গুছিয়ে আলোচনা করা আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে সম্ভব হবে না। আমরা সকলেই টেলিভিশনের সামনে থেকে উঠে এসেছি। পত্রপত্রিকা পড়ে আমরা এখানে আসছি। প্রতি মুহূর্তে ঘটনা বদলাচ্ছে। সুতরাং, আমাদের আলোচনা এলোমেলো হতে বাধ্য। [০০:২৪:০১–০০:২৪:৪৫]

আমি যা বলব, আমার দিক থেকে যে-জিনিসগুলোকে চোখে পড়েছে (উল্লেখ করার মতো), তার মধ্যে এক দিকে টক-শোগুলোতে ও পত্রিকাগুলোতে যা অলরেডি বলা হচ্ছে সে প্রসঙ্গগুলো যেমন থাকবে, তেমনই আরেক দিকে, যা টক-শোতে আলোচনা হচ্ছে না বা ঠিক যেভাবে আলোচনা হতে পারত বলে আমার মনে হচ্ছে, সেরকমভাবে আলোচনা হচ্ছে না, সে রকম প্রসঙ্গও থাকবে। কিন্তু, উভয় ক্ষেত্রেই এমন কোনো আলোচনা আমরা তুলছি না, তুলব না, যেটা খুব কঠিন, জটিল, দার্শনিক, ও তাত্ত্বিক। 'দার্শনিক' 'তাত্ত্বিক' কথাগুলোর মানে তো এটাই যে, তা বোঝা যায় না। সেরকম কোনো আলোচনা আমরা তুলছি না। [কোনো আরোপিত, আগে-থাকতে-ঠিক-করে-রাখা আইডিয়া-অনুমান-থিওরি পকেটে নিয়ে আমরা ঘটনার মর্ম বোঝার দিকে এগোবো না।] আমরা খুব শাদা চোখে, কমনসেন্স থেকে (কমনসেন্স ইজ অলওয়েজ দ্য হাইয়েস্ট নলেজ) পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করব। [০০:২৪:৪৬–০০:২৬:৩৯]

প্রত্যেক মানুষের মনেই স্বাধীনতার শুভবীজ রোপিত থাকে। আর, যে-মানুষ তার সাথের মানুষকে এতটা নিচু করে রাখে যে তাকে দাসত্বের অবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়, সে-মানুষ সর্বোচ্চ অপরাধ করে আল্লাহর বিরুদ্ধে এবং মানুষের বিরুদ্ধে।

হেনরি গার্নেট, ১৮৪৩

কথকতা তিন

বিদ্রোহের গতিধর্ম: বিদ্রোহের সমাজতত্ত্ব

বিদ্রোহের চরিত্র মুক্তিপরায়ন। কিছু জুলুম, কিছু অনিয়ম, কিছু অত্যাচার (অসহনীয় মাত্রায়) এগুলোর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই বিডিআররা এই ধরনের বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়। [০০:২৯:৪৬–০০:৩০: ৪৬]

৩.১ গণবিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য

গণবিদ্রোহের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: গণবিদ্রোহ হঠাৎ করে ঘটে। হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটে। তার মানে, গণবিদ্রোহের একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গণবিদ্রোহ স্বতঃস্ফূর্ত। জনগণের পক্ষ থেকে, বা গোটা একটা বাহিনীর সমস্ত মেম্বারদের পক্ষ থেকে, কিছু লোক আলাদা করে বৈঠক করে, আলাদা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে, সশস্ত্র বিদ্রোহ করে, তখন সেই বিদ্রোহ হয়ে যায় ষড়যন্ত্রমূলক। সেটা স্বতঃস্ফূর্ত-গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় না। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক, অগণতান্ত্রিক, কর্তৃত্বপরায়ন নেচারের বিদ্রোহগুলো গণবিদ্রোহের আকার ধারণ করে না। তা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় না। গণবিদ্রোহ হঠাৎ কোন এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আচমকা বিষ্ফোরিত হয়। তখন বোঝা যায় যে, এর পেছনে বহু কালের, বহু বেশি নিপীড়ন, অচিন্তনীয় মাত্রায় নিপীড়ন, দীর্ঘ কাল ধরে চলেছে, এবং সেই নিপীড়ন নিরসনের কোনো স্বাভাবিক পথ খোলা রাখা হয় নি। [০০:৪৯:০৮–০০:৫০:১৫]

৩.২ বিশৃঙ্খলা নয়, স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ

বিডিআরের এই ঘটনাটাকে মিডিয়া ও সরকার ‘বিদ্রোহ’ বলে আখ্যায়িত করেছে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ। এইটা প্রকৃতই একটা বিদ্রোহ। এইটা ‘বিশৃঙ্খলা’ না। এখনও পর্যন্ত যা মনে হচ্ছে সবকিছু দেখেশুনে, যতটুকু জানা আছে আমাদের (মিডিয়া এবং পত্রপত্রিকা থেকেই মূলত, অন্য কোনো সোর্স থেকে আমার কাছে কোনো খবর নাই, ব্যক্তিগত কোনোভাবে আমি কোনো খবর জানি না, জানার মতো সুযোগও নাই), তাতে দেখা যাচ্ছে যে: এই বিদ্রোহ স্বতঃস্ফূর্ত। এই বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ পরিচালনা করার যে-সাংগঠনিক কাঠামো, সেই কাঠামো খুবই গণতান্ত্রিক, খুবই ওপেন। সেখানে সামরিক শৃঙ্খলা প্রধান না—নিজেদের মধ্যে। নিজেদের মধ্যে বরঞ্চ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, লেনদেন, আলাপ-আলোচনা করে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো ব্যাপারই প্রধান। সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কোনো একক সংস্থা এদের নাই। কোনো একক (বা একগুচ্ছ—এক জন, দুই জন বা তিন জন) লিডার নাই। এটা *সমস্ত* মেম্বারদের যৌথ একটা কর্মকাণ্ড। এবং আমি আগেই বলেছি (শুরুতেই একেবারে) যে, তাদের নিজেদের মধ্যে সমঝোতা

খুবই অটুট, খুবই গভীর। [০০:২৬:৪০–০০:২৮:১৪]

এই সমঝোতার পাটাতনটা কী সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। কীসের ভিত্তিতে এরকম একটা সমঝোতা গড়ে উঠল। তার ইতিহাস কী? তার ঘটনা কী? তার অর্থ নৈতিক কারণ কী? তার রাজনৈতিক কারণ কী? তার সামরিক কারণ কী—বাহিনী পরিচালনা-করা-গত কারণ কী? বৃহত্তর সমাজের মধ্যে এর কী কারণ আছে? [০০:২৮:১৫–০০:২৮:৩৩]

তাহলে আমরা দেখলাম, এই বিদ্রোহের কাঠামো কর্তৃত্বপরায়ন না। বিদ্রোহের কাঠামো স্বতঃস্ফূর্ত, গণতান্ত্রিক এবং বিদ্রোহীদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছে। নিজেদেরকে নিজেরা পরিচালনা করছে। তাদের মধ্যে অটুট সংহতি আছে। বিদ্রোহের মধ্যে আমরা কিন্তু কোনো—বিদ্রোহীদের দিক থেকে বিদ্রোহ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে—খুব বড় বিশৃঙ্খলা দেখি নি। কিছু জিনিস দেখেছি, যেটাকে শাসকদের চোখে 'বাড়াবাড়ি' মনে হবে, 'অতিরিক্ত' মনে হবে, 'বিশৃঙ্খলা' মনে হবে[১৩]। যেমন: অফিসারদেরকে একেবারে মেরে ফেলা। জিম্মি করে রাখলেও হয়ত চলত, দাবিদাওয়া আদায় করা যেত। কিন্তু একেবারে প্রাণে মেরে ফেলা! কতজন অফিসারকে মেরে ফেলা হয়েছে, কেউ ভালো করে বলতে পারছেন না। প্রতিমন্ত্রী বলেছেন (আইন প্রতিমন্ত্রী) যে, ৫০ জন মারা গেছেন, এদের মধ্যে সবাই অফিসার না যদিও। কিন্তু অনেক অফিসার মারা গেছেন এমন একটা গুজব গোটা শহরের মধ্যে আছে। [০০:২৮:৩৪–০০:২৯:৪৫]

৩.৩ ষড়যন্ত্র নয়, গণবিদ্রোহ

কেউ কেউ এটাকে, বিডিআরের বিদ্রোহকে (ফজলুর রহমান[১৪] যেরকম), বলেছেন: 'কমান্ড ফেইলিওর'। তারপর নুরুল কবিরকে দেখলাম যে, 'ইন্টেলিজেন্স ফেইলিওর' এর উপর খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। আরো অনেককেও দেখলাম, আবেদ খানদেরকেও দেখলাম যে: ইন্টেলিজেন্স ফেইলিউর—'এত বড় একটা বিদ্রোহ হয়ে গেল, ইন্টেলিজেন্স কী করে!' [০১:১৮:৪০–০১:১৯:০৮]

এই ধরনের উষ্মা, বিস্ময় ও আক্ষেপের মধ্যে কিছু অনুমান কাজ করে। একটা অনুমান হচ্ছে যে: গোয়েন্দা সংস্থার মেম্বাররা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার মানুষ। যেন পৃথিবীতে যা কিছুই ঘটবে, তারা জানতে বাধ্য। বাস্তবে এটা ঘটে না। পৃথিবীতে কোথাও আচমকা বিশাল গণবিদ্রোহ আগের দিন কেউ টের পায় না। তার একটা বড় কারণ হচ্ছে: পরের দিন যে বিদ্রোহটা আদৌ হবে, সেটা পরের দিন বিদ্রোহটা না হওয়া

---

[১৩] এই প্রসঙ্গে পরে ৩.৫ অংশে আলোচনা আছে।

[১৪] বিডিআরের এই সাবেক মহাপরিচালক বিদ্রোহের প্রথম অথবা দ্বিতীয় দিনে, আমার মনে পড়ছে না, টেলিভিশনের একটি টক-শো'তে এ কথা বলেছিলেন। সুনির্দিষ্ট হদিস খুঁজে বের করতে ইন্টারনেটের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। তাতে জানা গেল: "এই বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিডিআর-এর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ফজলুর রহমান রেডিও তেহরানকে বলেন, সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের চেইন অফ কমান্ডের ব্যর্থতার কারণেই এ ঘটনা ঘটেছে।" (প্রথম আলো ব্লগ, ২০০৯)

পর্যন্তও কেউ জানে না। কেউ নিশ্চিত হতে পারে না। ঠিক না? [০১:১৯:০৯–০১:১৯:৫৪]

এই যে আর্মির নিপীড়নের বিরুদ্ধে (বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্মির নিপীড়নের বিরুদ্ধে) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে-বিদ্রোহ[১৫] হলো, এ রকম একটা বিদ্রোহ যে হবে, আগের দিন কল্পনা করেছে কেউ? ২১ তারিখে সকালবেলা কল্পনা করেছে কেউ? ২২ তারিখ কল্পনা করেছে কেউ রাজশাহীতে: এখানে কী হবে? কল্পনা করে নি। কিংবা, এখানে যখন ৩০শে অক্টোবর [২০০৪ সালে] ছাত্ররা বিদ্রোহ করে, মনে হলো যেন আচমকা ঘুমের থেকে উঠে শত শত মেয়ে, শত শত ছেলে বিক্ষোভ-মিছিল-ভাঙচুরে লিপ্ত হলো। ছাত্রী হল, ছাত্র হল থেকে (ছাত্রী হলে তো ঘটনার সূত্রপাতই, ওখানে 'বহিরাগত'র অনুপ্রবেশ থেকে সূত্রপাত), সব দিক থেকে। এরকম সারাদিন ধরে ভাঙচুর হবে, রক্তপাত হয়ে যাবে, পুলিশ বর্বরভাবে এটাকে নিপীড়ন করবে, আগের দিনও ছাত্ররা জানত না, কেউ জানত না। [০১:১৯:৫৫–০১:২০:৪২]

[স্বাধীনতা, মর্যাদা আর সমতা অভিমুখে নিপীড়িতদের দিক থেকে যেটা 'বিদ্রোহ', কর্তাদের দিক থেকে সেটাই তো 'কমান্ড ফেইলিওর' বা 'ইন্টেলিজেন্স ফেইলিওর', তাই না? ইন্টেলিজেন্স ফেইলিওর বা কমান্ড ফেইলওরের ধারণা দিয়ে সামরিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার কর্মচারীদেরকে পরিচালনার ক্ষেত্রে এফিসিয়েন্সি কেমন সেটা বিচার করা যেতে পারে, কিংবা কতিপয় সুযোগসন্ধানী ভাড়াটিয়া দুর্বৃত্তের যড়যন্ত্রকে বোঝা যেতে পারে, কিন্তু দেশব্যাপী বিস্তৃত একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহকে ব্যাখ্যা করা যায় না। উপলব্ধি ও ব্যাখ্যার এই পদ্ধতি গণতান্ত্রিক মানসিকতাপ্রসূত নয়, কর্তৃত্বপরায়ন প্রবণতারই প্রকাশ বরং।]

আরেকটা অনুমান আছে যে: ঐ ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী যদি তারা [গোয়েন্দারা] না থাকে, তাহলে তাদেরকে সেটা বানিয়ে তুলতে হবে। তাদেরকে এমন ট্রেনিং দিতে হবে, এমন যন্ত্রপাতি দিতে হবে, এমন ক্ষমতা দিতে হবে, এমন আইন দিতে হবে, যেন তারা কার মনে কী আছে, কখন কী ঘটবে রাষ্ট্রের মধ্যে—সব জানতে পারে। তার মানে: এদেরকে 'অল পাওয়ারফুল' করে তুলতে হবে। নুরুল কবির, বা যাঁরা এই মন্তব্যটা করেন, তাঁরা খেয়াল করেন না, কতখানি বিপদ তাঁরা ডেকে আনছেন। [সমাজের সদস্যদের নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার সীমা নতুন করে সংকুচিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয় এইসব প্রস্তাবের ফলে। রাষ্ট্রের, গোয়েন্দাদের, কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা যত বাড়ে, সমাজের ও সামরিক-বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহের

---

[১৫] **বিশ্বদ্যিালয়ে আগস্ট বিদ্রোহ:** বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষার্থে জরুরি জমানার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে, ২০০৭ সালের আগস্ট মাসের শেষার্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত শিক্ষক-শিক্ষার্থী-বিদ্রোহের কথা এখানে বলা হচ্ছে—বিশেষত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১শে আগস্টের অভূতপূর্ব মৌনমিছিল এবং ২২শে আগস্টের ব্যাপক মাত্রায় বিক্ষোভ-সমাবেশ-মিছিল-প্রতিরোধের কথা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ২২শে আগস্টে পুলিশের গুলিতে একজনের মৃত্যু ঘটে। পরের ঘটনাপ্রবাহে সুশীল সামরিক জরুরি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পিছু হটা, ছাত্রশিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তিপ্রদান এবং শিথিল হয়ে পড়ার ইতিহাস সবারই জানা।

সাধারণ সদস্যদের ক্ষমতা ততই কমে আসতে থাকে: একথা বুঝতে অনেক বুদ্ধিমান হতে হয় না। কমান্ড যত কট্টর হবে, সদস্যদের স্বাধীনতা-মর্যাদা-অধিকার তত কমে যাবে; বেড়ে যাবে নানারকম বৈষম্য, এবং ততই বেড়ে যাবে বিদ্রোহের আশঙ্কা। সদস্যদের সকলের স্বাধীনতা-মর্যাদা-অধিকার-অবকাশ-আনন্দ যথাসম্ভব বাড়ানোর মধ্য দিয়ে এবং সর্বপ্রকার বৈষম্য যথাসম্ভব কমানোর মাধ্যমেই একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়।] আর, এই ইন্টেজিলেন্স ফেইলিওর (এটা আদৌ যদি ইন্টেজিলেন্স ফেইলিওর হয়েও থাকে) যদি না ঘটত, তাহলে তো 'বিদ্রোহ'ই হতো না! 'ষড়যন্ত্রী' নাম দিয়ে ১০ জন, ২০ জন, ৩০ জন, ৪০ জন, ৫০ জন, ১০০ জন বিডিআর জওয়ানকে বা অফিসারকে—কাদেরকে আমি জানি না—নানানজনকে ফাঁসিটাসি দিয়ে দেয়া হতো, কোর্ট মার্শাল করে দেয়া হতো, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতো। বিডিআর আরও খারাপ অবস্থায় নিপতিত হতো। ভবিষ্যতে হয়ত আরও বড় কোনো বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটত। [০১:২০:৪৩–০১:২১:৪৬]

তাহলে, এই রকম 'আপসেট ঘটনা' যখন ঘটে, তখন 'বিদ্রোহ'কে ন্যায়সম্মত বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। ফলে, এইটাকে ইন্টেজিলেন্স ফেইলিওর মনে করার কেনো কারণ নেই। [০১:২৩:১৬–০১:২৩:৩০]

এরই মধ্যে কেউ কেউ অলরেডি বলছেন যে, বাইরের ইন্ধন[১৬] আছে, ষড়যন্ত্র আছে। তো, 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' দিয়ে এ রকম গণবিদ্রোহকে এক্সপ্লেইন করা যায় না।[১৭] [০১:৩১:০৮–০১:৩১:১৬]

---

[১৬] **দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভই বিদ্রোহের কারণ**: বিদ্রোহের প্রায় তিন মাসের মাথায় প্রকাশিত সরকারী তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন মোতাবেক:

> পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনার সঙ্গে বাইরের যোগসূত্র খুঁজে পায়নি এই ঘটনা তদন্তে গঠিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কমিটি। ডাল-ভাত কর্মসূচীসহ বিডিআর সদস্যদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভই বিদ্রোহের কারণ বলে মনে কনে কমিটি।" ("বিডিআর বিদ্রোহে বাইরের কারও সম্পৃক্ততা পায়নি তদন্ত কমিটি/প্রতিবেদন জমা দিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটি", *প্রথম আলো*, প্রথম পাতার প্রথম শিরোনাম, ২২শে মে ২০০৯)

[১৭] **ষড়যন্ত্র নয়—সবাই জানত বিদ্রোহ হবে**: "গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত রাইফেলস সিকিইরটি ইউনিটের সাধারণ সৈনিকদের বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফলে, সরকার কোনো আগাম তথ্য পায় নি।" ("প্রশ্নোত্তরে প্রধানমন্ত্রী: বিডিআর বিদ্রোহ সম্পর্কে গোয়েন্দা সংস্থা আগাম তথ্য জানাতে পারে নি", *প্রথম আলো*, ১৮ই জুন ২০০৯, প্রথম পাতা, ওপরের ভাঁজে বাম দিকে বক্স-স্টোরি) সরকার জানতে না-পারলেও অফিসাররা জানতেন, জওয়ানরা জানতেন, মহাপরিচালক জানতেন, সবাই জানতেন। "বিদ্রোহের ইঙ্গিত পেয়েও ব্যবস্থা নেন নি বিডিআর কর্মকর্তারা" নামের নিচের এই বিবরণে (*প্রথম আলো*, ১৮ই জুন ২০০৯, প্রথম পাতা, ওপরের ভাঁজে বাম দিকে বক্স-স্টোরি) তার সাক্ষ্য অখণ্ডনীয়:

> বিডিআর জওয়ানেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারেন—বিষয়টি আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন মহাপরিচালকসহ অনেক কর্মকর্তা। ... মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ জওয়ানদের সব ক্ষোভবিক্ষোভ দরবার হলে সামাল দিতে চেয়েছিলেন। নিহত বিডিআর কর্মকর্তাদের মোবাইল ফোনে কথোপকথন, ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) রেকর্ড, বেঁচে যাওয়া সেনা কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য এবং গ্রেপ্তার করা জওয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা এসব তথ্য জানতে পেরেছেন।

[২৫শে ফেব্রুয়ারি সারাদিন ধরে বিদ্রোহের টিভি-চিত্রায়ন দেখে মনে হয়েছে, সারা দেশের গোটা বিডিআর বাহিনীর প্রায় সমস্ত অথবা বেশিরভাগ জোয়ানই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, দৈহিক বা মানসিকভাবে এই বিদ্রোহের সাথে জড়িত। বিডিআরের মতো একটি বাহিনীতে, যেখানে অতিশয় কঠোর শৃঙ্খলা ও সুনির্দিষ্ট শাস্তির পরিবেশের মধ্যে সৈনিকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, এবং যেখানে একজন সৈনিকের পক্ষেও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার কথা কল্পনা করা অসম্ভব প্রায়, সেখানে প্রচুর সংখ্যক বিডিআর-সদস্য যে একেবারে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে বসল, তার পিছনে পুরো বাহিনীর দৃঢ় নৈতিক সম্মতি, প্রগাঢ় সহমর্মিতা ও প্রবল সমর্থন না-থাকলে এরকম বিদ্রোহ আশা করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র দেশী-বিদেশী 'ষড়যন্ত্রকারীদের' পক্ষে বিদ্রোহের এরকম একটা সার্বিক পাটাতন কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা একদম অসম্ভব একটা ব্যাপার। এটা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

অধিকন্তু, রাষ্ট্রকর্তারা (সমস্ত প্রকার কর্তাগণ) তো কিছু ঘটলেই 'ষড়যন্ত্র' 'ষড়যন্ত্র' বলে কলরব তোলেন, কিন্তু কখনই সামান্যতম কোনো প্রমাণও মানুষের সামনে হাজির করতে পারেন না। এই 'বিদ্রোহ'কে ষড়যন্ত্রের মুখস্থ দাবি দিয়ে যাঁরা 'বিশ্লেষণ' করছেন, তাঁরা 'প্রমাণ' হিসেবে বলেছেন তথাকথিত মুখোশের কথা। তাঁদের প্রশ্ন: সমস্ত জওয়ান একই রকম লাল কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখল কেন, কীভাবে? উত্তর: তার মানে, আগে থেকেই 'ষড়যন্ত্র' ছিল। প্রকৃত ঘটনা টিভি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন। সত্যিকারের মুখোশ কোথাও ছিল না। ছিল লাল, হলুদ নানা রঙের (একরঙা নয়) ব্যানারের কাপড় ছিঁড়ে তা দিয়ে চোখের নিচ পর্যন্ত ঢেকে রেখে সিসি-ক্যামেরা বা টিভি-ক্যামেরার সামনে যাওয়া। টিভিতে দেখানো ফুটেজ এবং বিভিন্ন আলোকচিত্রে

... মহাপরিচালক চেয়েছিলেন দরবারে আলোচনার মাধ্যমে সবকিছু সমাধান করতে ...

...

বিদ্রোহ না হলেও ভেতরে ভেতরে জওয়ানের যে ফুঁসছেন, সেটা বিডিআর কর্মকর্তারা ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন। বিদ্রোহের ঘটনায় নিহত কর্মকর্তাদের মোবাইল ফোনের এসএমএস ও তাঁদের ডায়েরি থেকে এমন তথ্য পাওয়া গেছে ... বিদ্রোহের আগে দিনাজপুরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এলাহী তাঁর অধীন মেজর পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে (জিএস-২) এই এসএমএস পাঠান। এতে বলা হয়, 'Subversive activities undermining BDR during BDR week' (বিডিআর সপ্তাহে নাশকতামূলক ঘটনা ঘটতে পারে)। ... সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদে ১৩ রাইফেলস ব্যাটেলিয়নের জওয়ান শহীদুর রহমান জানান, ২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা সাতটার দিকে টাট্টু শো দেখতে গেলে ল্যান্স নায়েক রফিক, জওয়ান নুরুন্নবী ও নায়েক ফিরোজ খান তাক বলে, 'এবার একটা গণ্ডগোল হয় নাকি। জওয়ান শহীদুর আরও জানান, ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে রোল কল করার জন্য মাঠে গেলে ডিএডি তৌহিদ তাকে বলেন, 'আগামীকাল দরবার আছে, হয়ত টুকটাক গণ্ডগোল হতে পারে। তোমরা ৩ নম্বর গেট পাহারা দিবা, যাতে কেউ ভেতরে আসতে বা যেতে না পারে।' জিজ্ঞাসাবাদে জওয়ানরা জানান, ২১ ফেব্রুয়ারি লিফলেট বিতরণের পর অস্ত্রাগারের দায়িত্বে জওয়ানদের পাশাপাশি কর্মকর্তাদেরও মোতায়েন করা হয়। ওইদিন বিডিআর কর্মকর্তা মেজর মামুন তাঁর সহকর্মী মেজর রিয়াজকে বলেছিলেন, প্রচারপত্র বিলির কারণে অস্ত্রাগারের দায়িত্ব কর্মকর্তাদের দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং, এটা এমন ব্যাপক মাত্রার গণবিদ্রোহ যেখানে 'কিছু একটা' যে দরবারের দিন ঘটবে সেকথা মহাপরিচালক থেকে আরম্ভ করে জওয়ান পর্যন্ত সবাই জানত। সুতরাং, ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব দিয়ে একে ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগই নেই।

যেমনটা দেখা গেছে, তাতে কাপড়গুলো যে বিডিআর-সপ্তাহের উৎসবের জন্য কেনা ও সাজানো ব্যানার-ফেস্টুন থেকে ছিঁড়ে নেওয়া তাতে সামান্য সন্দেহও নেই। এমনকি গামছা্ও ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই মুখ-ঢাকা কৌশল যে মূলত প্যালেস্টাইনী-আরব গেরিলাদের দেখে শেখা, তাও বোঝা সহজ। গত ৩০/৪০ বছর ধরে এই গেরিলারা বাংলাদেশে আরব মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকৃত। আরব গেরিলারা ছাড়াও, পশ্চিমা দেশগুলোতে এবং অন্যত্র কর্তৃপক্ষের ক্লোজসার্কিট-টিভি-ক্যামেরা এবং সাংবাদিকদের স্থির ও ভিডিও ক্যামেরার নজরদারি এড়াতে রাস্তায় প্রকাশ্যে গণমিছিল করা লোকজনকেও এরকম ও অন্যরকম বিভিন্ন সত্যিকারের মুখোশের আশ্রয় নিতে হয়। রাষ্ট্রীয় ও যাবতীয় কর্তৃপক্ষের ক্রমবর্ধমান ও ক্রমশ-কঠোর-হতে-থাকা নজরদারির জন্যই প্রকাশ্য গণতান্ত্রিক কায়দার প্রতিবাদী থেকে শুরু করে সশস্ত্র বিদ্রোহীদেরকে পর্যন্ত মুখোশের আশ্রয় নিতে হয়। এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের কিছুই নাই। সবচেয়ে বড় কথা, বিডিআরের সকল বিদ্রোহী জওয়ানের মুখে 'মুখোশ' ছিল না। টিভিতে-ছবিতে আমরা খোলা-মুখের অনেক জওয়ানকে চলাচল করতে দেখেছি। এটা বিদ্রোহের গণচরিত্র ও স্বতঃস্ফূর্ততারই অন্যতম প্রমাণ।

অনেকে এমন দাবিও করছেন, পিলখানায় নাকি দুর্বৃত্ত-দুষ্কৃতকারীদের ফেলে-যাওয়া এমনসব যন্ত্রপাতি গোয়েন্দারা পরে পেয়েছেন যেগুলো বিডিআর ব্যবহার করে না। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ রকম একটা বস্তুও সুনির্দিষ্টভাবে হাজির করতে পারেন নি কেউ।]

যাই হোক, কোনোরকম অনুমান-টনুমানের মধ্যে আমরা যাব না। আমরা যা জানি, যা ঘটেছে, যা আমরা দেখেছি টিভিতে, শুনেছি, সেগুলোর ভিত্তিতে এটাকে খোলা চোখে বুঝতে চাচ্ছি। 'ষড়যন্ত্র' যেটা হবে, সেটা গোপনে হবে। ওটা আমাদেরকে বলে-কয়ে হবে না। ওটা আমাদের কথা শুনে হবে না। ওটা আমাদের অনুমানের ওপর নির্ভর করবে না। যত বেশি খোলাভাবে, যত বেশি গণতান্ত্রিকভাবে, যত বেশি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে, পারলে গোটা দেশের লোকের মতামত নিয়ে, যদি সমস্যা সমাধানের দিকে যাওয়া যায়, আলোচনার মাধ্যমে, সমঝোতার মাধ্যমে, দরদের মাধ্যমে, ভালোবাসার মাধ্যমে, তবেই সেটা মঙ্গল আনবে, না-হলে সেটা অমঙ্গল হবে। এই পর্যন্তই বলতে পারি আমরা। [২য় অডিও-ফাইলের ০০:০৭:২৮–০০:০৮:৩০]

৩.৪ রাজনৈতিক ইন্ধন নয়, 'ক্ষোভের প্রকাশ' এই বিদ্রোহ

[বিডিআর সদস্যদের এই বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিডিআর-এর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ফজলুর রহমান 'রেডিও তেহরান'কে বলেন:

> বিডিআরের ব্যাপক জনসমর্থিত কর্মসূচী অপারেশন ডালভাত নিয়ে বিডিআর সদস্যরা যে অভিযোগ তুলেছেন তা অনেকটাই সঠিক। তিনি বলেন বিডিআর সদস্যরা ঠিকমতো ছুটি পায় না, তাদের বেতন কাঠামো নিয়েও বৈষম্য রয়েছে। তিনি বলেন দীর্ঘ দিনের জমে থাকা

এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিদ্রোহের মাধ্যমে। সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিডিআর জওয়ানরা হঠাৎ করে এতো আক্রমণাত্মক হবার পেছনে কোন রাজনৈতিক ইন্ধন রয়েছে কিনা—এমন প্রশ্নের জবাবে বিডিআরের সাবেক প্রধান ফজলুর রহমান বলেন, এ ঘটনার পেছনে কোনো রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। (তেহরান বাংলা রেডিও, ২০০৯)]

৩.৫ বঞ্চনা, আত্মকর্তৃত্ব এবং আত্মমর্যাদার পাটাতন

টিভিতে আমরা দর্শকদেরকে বলতে দেখেছি। দু-একজন সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার যে মিডিয়া নিয়েছে, তাতে দু-রকম মত আসতে দেখেছি এক্ষেত্রে। বেশ বুড়ো একজন ভদ্রলোককে বলতে দেখলাম যে, 'এরা তো ডিসিপ্লিন্ড; এরা নিজেরা দেশরক্ষার দায়িত্বে; এরাই যদি নিজেরা বিদ্রোহ করা শুরু করে, সেটা তো ভালো না।' মানে তাঁর এই বিদ্রোহের প্রতি নেতিবাচক ধারণা আছে। কিন্তু, আমরা অন্য প্রায় সবাইকেই বলতে শুনেছি—সাধারণ মানুষকেও এবং অন্যদেরকেও—যে: এই বিদ্রোহের পেছনে তো কারণ[১৮] আছে; এরা দেশরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত; অথচ এরা যথেষ্ট পেইড না; তারা নানান ধরনের নানান কিছুর শিকার। [০১:৩২:৫৩–০১:৩৩:৩৫]

আপাতত মনে হচ্ছে যে, সেনাবাহিনী থেকে অফিসার এনে বিডিআর পরিচালনা করা যাবে না—এটা তাদের একটা প্রধান দাবি। আর একটা প্রধান অভিযোগ—তারা অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি বঞ্চিত, তারা জাতিসঙ্ঘের শান্তি-মিশনে যেতে পারে না, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত হয়। অর্থনৈতিক বঞ্চনারই অনেকগুলা দিক আছে। তারা নির্বাচনে যে বাড়তি কাজ করেছে সেই কাজের জন্য তাদের যে বাড়তি টাকা পাওয়ার কথা ছিল তারা সেটা পায় নি, অফিসাররা মেরে খেয়েছে বলে তাদের অভিযোগ। তারপর 'অপারেশন ডালভাত' নিয়ে প্রচুর দুর্নীতি হয়েছে। বিডিআরের জওয়ানরা আন্তরিকভাবে কাজ করেছে সারা দেশে, কিন্তু অফিসাররা এখান থেকে প্রচুর লুটপাট করেছে; হিসাব উল্টাপাল্টা করেছে। এ রকম আরো অনেক রকম ভাবে তারা অর্থ নৈতিক অর্থে বঞ্চিত। [০০:৩০:৪৭–০০:৩১:৩৪]

অর্থনৈতিক বঞ্চনা একটা বড় দিক। আরও একটা বড় দিক ঐ যে বললাম: কর্তৃত্বের জায়গাটা তারা চায়—নিজেদের অফিসার চায়। কিংবা তারা এমনও রাজি, তারা অনেকেই টিভিতে বলেছে যে, বিসিএসের মতো আলাদা 'বিডিআর ক্যাডার' করে যদি অফিসার নিয়োগ করা হয়, তারা মেনে নেবে। [০০:৩০:৩৪–০০:৩১:৪৮]

---

[১৮] **অপারেশন ডাল-ভাত বিদ্রোহের প্রধান কারণ**: বদ্রোহের আড়াই মাস পরে প্রকাশিত 'সেনা তদন্ত আদালত' এর প্রতিবেদনে বলা হয়: "অপারেশন ডাল-ভাতই বিডিআর বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ। এর সঙ্গে রয়েছে বিডিআর সদস্যদের তুলনায় সেনা কর্মকর্তাদের সুযোগসুবিধা নিয়ে বিরূপ ধারণা, বিডিআরের দোকান পরিচালনা নিয়ে অসন্তোষ, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দায়িত্ব পালনের পর বিডিআর জওয়ানদের বিল না পাওয়া, সদর দপ্তরের ভেতরে ঠিকাদারি কাজের নিয়ন্ত্রণ, বিডিআর স্কুলে ভর্তি, স্কুল পরিচালনা করা এবং সৈনিকদের অবৈধ আয়ের পথ বন্ধ করা।" ("বিডিআর বিদ্রোহের পেছনে 'ডাল-ভাত'সহ সাত কারণ/সেনাবাহিনীর তদন্ত আদালতের প্রতিবেদনে বিডিআর কর্তৃপক্ষ ও গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতাকেও দায়ী করা হয়েছে", *প্রথম আলো*, প্রথম পাতা নিচের ভাঁজে ডান দিকে, ১৫ই মে ২০০৯)

সেনাবাহিনীর তুলনায় বিডিআর-বাহিনীর মর্যাদা কম—যেমন ক্যাডেট কলেজে যারা পড়ে, তারা গ্রামের স্কুলে পড়া ছাত্রদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান। যারা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, বিখ্যাত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারা অনেক বেশি মর্যাদাবান। ইত্যাদি প্রভৃতি। যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক রকম বৈষম্য আছে, অনেক রকমের শিক্ষাব্যবস্থা আছে, সেরকম আমরা দেখছি, আমাদের সামরিক বাহিনীগুলোর [রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের] মধ্যেও অনেক আলাদা আলাদা বাহিনী আছে এবং সব বাহিনীর মর্যাদা একই রকম না। বিডিআররা অত দূর গিয়ে না-বললেও বোঝা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে এই মর্যাদা নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে। সেনাবাহিনীর মর্যাদা যেরকম আনসার-বাহিনীর মর্যাদা সেরকম না। পুলিশ-বাহিনীর মর্যাদা যে রকম, র‍্যাবের মর্যাদা সে রকম না। এবং এই বাহিনীগুলো মোট যেরকম সরকারী বরাদ্দ পায়, বাজেট পায়, সুবিধা পায়, ফ্যাসিলিটিজ পায়—এগুলোর মধ্যেও প্রচুর বৈষম্য আছে, এক বাহিনীর সঙ্গে অন্য বাহিনীর ক্ষেত্রে। তো, সব বাহিনীই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, আন্তরিকভাবে, কঠোর-সুশৃঙ্খল ট্রেনিঙের মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের মর্যাদা এক রকম না।[১৯] [০০:৩২:৪০– ০০:৩৩:৪৯]

তার মানে তারা কিন্তু এইটা বলছে না যে, বিডিআর-বাহিনীটাকে 'অফিসার বনাম জওয়ান' এই বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে হবে। এই দাবি তারা তুলছে না। [অফিসারতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত করে বিডিআরকে তারা আমলাতন্ত্রবর্জিত, হায়ারার্কিবিহীন সমতা-মর্যাদা-স্বাধীনতার ভিত্তিতে পরিচালিত একটা গণবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার দাবি আদৌ তুলছে না।] এই দাবি তারা যদি তুলত, তাহলে এটাকে আরও অনেক বেশি মুক্তিপরায়ন দাবি বলে মনে হতো—আরও অনেক বেশি র‍্যাডিক্যাল, আরও অনেক বেশি মূলগত দাবি বলে মনে হতো। কিন্তু সেটা তারা বলছে না। তারা বলছে যে, সেনাবাহিনী থেকে অফিসার না-আসলেই হবে। এমনকি কেউ কেউ এরকমও বলেছেন যে, সেনাবাহিনী থেকে যদি সৎ ও ভালো অফিসার আসে, তা-ও হয়ত চলবে। কিন্তু, সামগ্রিক অর্থে তারা সেনাবাহিনীর অফিসারদেরকে অলরেডি

[১৯] বিডিআরের ৫০ দফা যে নালিশনামা *নিউ এজ* পত্রিকা ছেপেছে, তাতে বিডিআরের জওয়ান, রানার, ড্রাইভার, নায়েক হাবিলদার, কর্মকর্তা তথা আপামার সদস্যদের সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁরা তাঁদের দাসত্বের কথা তুলেছেন। বলেছেন ৪০০ সেনা-অফিসার ৪৬০০০ বিডিআরকে তাঁদের দাস মনে করেন। ['বাংলাদেশ মিলিটারি ফোর্সেস' এর ওয়েবসাইট (http://www.bdmilitary.com/) অনুসারে এই সংখ্যা প্রায় ৬৪০০০।] বিডিআর-সদস্যরা নিজেদেরকে তুলনা করেছেন আফ্রিকার দাসদের সাথে। আত্মমর্যাদার প্রশ্নটি যে বিদ্রোহের প্রধান একটা প্রশ্ন হিসেবে জারি ছিল, এইভাবে তার প্রকাশ ঘটে। (দ্রষ্টব্য: ৩১ নং দফা, পরিশিষ্ট ১। আরো অনেকগুলি দফায়ও দাসত্বমুক্তি ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের স্বপ্ন দেখার এই মনোভাবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রকাশ ঘটেছে।) আত্মমর্যাদার প্রশ্নটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ লাভ করেছে ৪৬ নং দফায়: "বিডিআরে যাঁরা একটু বুদ্ধিমান, তাঁদেরকে বিডিআর-হাসপাতালের তৃতীয় তলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই তলাটা কাজে লাগানো হয় কারাগারের মতো করে। মেডিক্যাল বোর্ড সেখানে তাঁদেরকে চাকরির জন্য অনুপযুক্ত ঘোষণা করে।" আর, অর্থনৈতিক বঞ্চনার কথা তো ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বিডিআর-সদস্যদের 'মানবাধিকার' এর প্রশ্নও তাঁরা তুলেছেন। বলেছেন, দেশে এত এত মানবাধিকার-সংগঠন থাকা সত্ত্বেও কেউ তাঁদের মানবাধিকারের কথা বলেন নি। (দ্রষ্টব্য: ৪৫ নং দফা)

আর আস্থায় নেন না (ভালোমন্দের জায়গায় না)। তার মানে বাহিনী হিসেবে বিডিআরের সমস্ত মেম্বার যে নিজের বাহিনীর আত্মসম্মান, মর্যাদা—এই জিনিসগুলো নিয়েও বিচলিত, এইটা বোঝা যাচ্ছে। [০০:৩১:৪৯–০০:৩২:৩৯]

আবার, একই বাহিনীর ভেতরে অফিসাররা অনেকবেশি সুবিধাভোগী, অনেক বেশি প্রিভিলেজড; জওয়ানরা সবচেয়ে কম প্রিভিলেজড। অফিসারদের বাড়ি-ঘর, সুযোগ-সুবিধা, তাদের জন্য চাকর-বাকর; এবং জওয়ানদের এগুলো একই রকমের না। অফিসারদের খাদ্য, তাদের জন্য বরাদ্দ, সব ধরনের ফ্যাসিলিটিজ—আমার বাড়ানোর দরকার নাই আলোচনা—এক রকম না। এটা সব বাহিনীর মধ্যেই আছে। সিভিলিয়ান বাহিনীর মধ্যেও আছে, সামরিক বাহিনীর মধ্যেও আছে। সচিবের সুযোগ-সুবিধা, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, বরাদ্দ, অর্থনৈতিক এই সমস্ত বেনিফিট, আর একজন চৌকিদারের, বা একজন সরকারী দারোয়ানের, কর্মচারীর, নিম্নস্তরের কর্মচারীর একই রকম না। [০০:৩৩:৫০–০০:৩৪:৪৫]

[বিডিআর-সদস্যদের মধ্যে সেনাবাহিনীর অফিসার, এমনকি সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যে প্রগাঢ় ক্ষোভ জন্ম নিয়েছে, যে-ক্ষোভ পরে গভীর বিদ্বেষের দিকে গড়িয়েছে, তা একদিনে জন্ম নেয়নি। এই বাহিনী বনাম ঐ বাহিনীর মতো একটা মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশও এখানে তৈরী হতে পেরেছে। সেনা, নৌ বা বিমানবাহিনীর একজন সদস্য যদি কোনো কারণে নিজেকে বঞ্চিত বোধ করেনও, তিনি কিন্তু তার জন্য চট করে অন্য একটা বাহিনীর অফিসারদেরকে তাঁর নিজের অবস্থার জন্য দায়ী করতে পারবেন না। বিডিআর-সদস্যরা এটা পারতেন। নিজেদের যাবতীয় বাস্তব ও কাল্পনিক দুর্দশার জন্য তাঁরা খুব সহজেই সেনা-অফিসারদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারতেন। নিজেদের সমস্যাগুলোকে 'বিডিআরের স্বার্থ' বনাম সেনাস্বার্থ' আকারে পর্যন্ত তারা সহজেই ভাবতে পেরেছেন (দ্রষ্টব্য: 'পরিশিষ্ট ১'-এ প্রদত্ত বিডিআর-বিদ্রোহের ৫০-দফা দাবি নামার ৪২ নং দফা)। এরকম পরিস্থিতিতে বৈষম্য-বঞ্চনার মানসিক বোধ তীব্র বিক্ষোভ-বিদ্বেষের দিকে যেতে সময় লাগে না। এই পরিস্থিতিতে বঞ্চিতবোধকারী লোকজন রাতারাতি নিজেদের এককাট্টা সংহতির জন্ম দিয়ে ফেলে। সমগ্র বিডিআর দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের চেয়ে 'উন্নত মর্যাদা'র অন্য একটা বাহিনীর অফিসারদের অধীনে থাকায় তাঁদের মধ্যে প্রবল একটা হীনম্মন্যতা-বোধ তৈরী হয়েছে।]

বিডিআরের ক্ষেত্রে এটাও আমরা দেখেছি যে, জওয়ান বনাম অফিসার, এই বঞ্চনার বোধও তাদের আছে। তাহলে, স্বাধীনতার প্রশ্নটা দুই রকম। প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিডিআর-এর স্বাধীনতা, মর্যাদা। আরেকটা হলো: ব্যক্তি হিসেবে জওয়ানদের মর্যাদা এবং স্বাধীনতা।[২০] এইসব কথা তারা খুব স্পষ্ট করে বলে নাই; তারা শুধু বলেছে:

[২০] **ক্রীতদাসের মুক্তি**: আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার আকুতি সর্বকালে সর্বমানুষের অন্তর্জাত আকুতি। বৃটিশ ঔপনিবেশিক গোলামির কালে স্বাধীনতার আবাহনকারী কোকিলের মতো করে কবি-বিদ্রোহী-শিক্ষক হেনরি লুই ডিরোজিও ক্রীতদাস-প্রথা এবং বন্দীত্ব থেকে মুক্তির আকুতি প্রকাশ করেছিলেন "ক্রীতদাসের মুক্তি" নামে তাঁর নিজের কবিতায়, ১৮২৭ সালে। তার বাংলা ভাবানুবাদ এ রকম:

সেনা অফিসার চলে গেলেই হবে, আমাদের অন্য অফিসার হলেই হবে। কিন্তু, আমরা বুঝতেই পারি যে, অন্য অফিসার এসেও যদি একইরকমভাবেই পরিচালিত করে, তাহলে জওয়ানদের মধ্যে আবার ক্ষোভ, আবার বঞ্চনা (এবং আলটিমেটলি কখনো ... তাদের মধ্যে বঞ্চনা সমাধানের স্বাভাবিক পথ খোলা না-থাকলে), আবার বিদ্রোহ– এই দিকেই যাবে। [০০:৫১:১৯–০০:৫৩:৪০]

তারা যদিও সেনা-অফিসারদের বিরুদ্ধেই বলছে বেশি বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু, এরই মধ্যে কি প্রচ্ছন্নভাবে, অফিসার-মাত্রেরই বিরুদ্ধে, [অফিসারতন্ত্রের বিরুদ্ধে] একটু ক্ষোভও নাই? প্রচ্ছন্নভাবেঃ যেটা এই মুহূর্তে তারা কেউ বলছেন না, হয়ত সচেতনভাবে ভাবছেনও না। যেমন, আমরা ১৯৭১ সালে, বা তার আগে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কথা বলার সময়, দেশ স্বাধীন করার সপক্ষে যুক্তি দেওয়ার সময় বলেছিলাম, প্রধানমন্ত্রী যেন বাঙালি হয়, দল যেন বাঙালি হয়, দেশ যেন বাঙালিরা চালায়। কেননা, ওদের সাথে আমরা অনেক চেষ্টা করলাম এক সাথে থাকার জন্য—পাকিস্তানীদের সাথে, পাঞ্জাবিদের সাথে—কিন্তু তারা সমান মর্যাদা নিয়ে চলার মতোন না। সুতরাং, বাঙালিদেরকে বাঙালিরাই পরিচালনা করবে। [০০:৩৪:৪৬–০০:৩৫:২৭]

আমরা কিন্তু এইটা বললাম না (একাত্তর সালের আগে) যে, আমরা এমন সেনাবাহিনী চাই, যে-সেনাবাহিনী জনগণের অংশ। জনগণ এবং সেনাবাহিনী, বন্দুক এবং জনগণ, যদি আলাদা হয়ে যায়, তবে ভয়ঙ্কর বিপদজনক পরিস্থিতি সমাজে হয়। [বিদ্যমান কাঠামোর কারণে এমনিতেই] পরিস্থিতিটা সবসময়ই খুব ভয়ঙ্কর অবস্থাতে থাকে, তথাপি নানান ধরনের নিয়ম-শৃঙ্খলা, হুকুম-কম্যান্ড, আইন-কানুন, সুযোগ-সুবিধা, শাস্তি—এগুলোর মধ্য দিয়ে বন্দুকটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় যেন ঐ ভয়ংকর অবস্থা তৈরী হতে না পারে। কিন্তু, তারপরও ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হওয়ার মতো একটা ঝুঁকি-পাটাতন সব সময় বিরাজ করে—যখন বন্দুক ও জনগণ সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে পড়ে, যখন তারা পরস্পরের অচেনা হয়ে পড়ে। [০০:৩৫:২৮–০০:৩৬:১৪]

আমরা জানি, সামরিক বাহিনীগুলোর মধ্যে সিভিলিয়ানদের সম্পর্কে এক ধরনের হেয় মনোভাব আছে। সাধারণভাবে এইটা আছে—কমবেশি আছে। সবার কথা এক না। সব জওয়ান, সব অফিসার এক রকম চিন্তা করেন না। কিন্তু, এইটা তাদের ট্রেইনিংয়ের অংশ। এইটা আর্মির কালচারের অংশ (আর্মি বলতে আমি সব ধরনের সামরিক বাহিনীগুলার কথাই বোঝাচ্ছি): যেন সিভিলিয়ানরা কম যোগ্য, তাঁরা বেশি

গোলাম যখন জানতে পারল যে সে তার দাসত্বের নির্বাসনদণ্ড থেকে মুক্ত, তখন তার অন্তরাত্মা আনন্দে উৎফুল হয়ে উঠল। যখন সে স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেল, তখন মুক্ত মানুষের উন্নত চিন্তাভাবনাগুলিও তার মনের অনন্ত আকাশে যেন তারার মতো ঝিকমিক করতে লাগল; কারো কাছে আর সে নতজানু হবে না, মাথা হেঁট করবে না, মাথা উঁচু করে উচ্চ চিন্তা করবে নির্ভিক বীরের মতো। এইকথা ভাবতে ভাবতে একবার সে আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখল, মুক্ত হাওয়া হাত বুলিয়ে গেল তার মাথায়। আনন্দে আত্মহারা হয়ে মুক্ত বিহঙ্গের ডানা-ঝাপটানি সে দেখতে লাগল। বহমান নদীর দিকে চেয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। ভাবতে লাগল– এই আকাশ, এই বাতাস, এই পাখি, এই নদী, এদের মতো আমিও স্বাধীন, আমিও মুক্ত। মুক্তি ও স্বাধীনতা কথার মধ্যে না-জানি কি ঐন্দ্রজালিক মোহ আছে! তার নাম করলেই যেন আত্মার বেদীমূলে আলোর প্রদীপ জ্বলে ওঠে, অনির্বাণ তার দীপশিখা। (বিনয় ঘোষ, ২০০৫: ২৭-২৮)

যোগ্য; সিভিলিয়ানরা দেশের জন্য কম করেন, তাঁরা বেশি করেন। এই রকমের একটা ফিলিং কিন্তু পাকিস্তানী আর্মির ভেতরে ছিল। ঐ একই জিনিস বাংলাদেশী আর্মির মধ্যেও আছে। আমরা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বলার সময় এইটা বলি নি যে, এই জিনিস তুলে দিয়ে জনগণ এবং আর্মিকে কাছাকাছি আনতে হবে। জনগণ যেন আর্মির অংশ হয়; আর্মি যেন জনগনের অংশ হয়। [০০:৩৬:১৫–০০:৩৬:৫৮]

আমরা বলেছিলাম, বাঙালি সেনাবাহিনী হলেই হবে; বাঙালি প্রধানমন্ত্রী হলেই হবে; বাঙালি ডিসি-এসপি, বাঙালি পুলিশ, বাঙালি ইপিআর হলেই হবে। তারই মধ্যে খুব প্রচ্ছন্নভাবে হলেও সমস্ত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধেই একটা ঝোঁক থেকে যায় কিনা সেটা আমি জানি না—বীজ আকারে, সুপ্ত আকারে থেকে যায় কিনা আমি জানি না। আমার মনের মধ্যে এই প্রশ্ন আসে। ।[০০:৩৬:৫৯–০০:৩৭:২২]

৩.৬ বাড়াবাড়ি, বর্বরতা ও রক্তক্ষয়: বিদ্রোহে সহিংসতার প্রশ্ন

তাহলে দেখলাম আমরা: এই বিদ্রোহ স্বতঃস্ফূর্ত, গণতান্ত্রিক, নিজেদের মধ্যে মুক্তিপরায়ন চরিত্রের, কিন্তু খুবই সুশৃঙ্খল—নিজেদের মধ্যে, এবং খুবই অটুট সমঝোতার ভিত্তিতে পরিচালিত। কিন্তু, বিদ্রোহ—দীর্ঘদিনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন—বিদ্রোহ হয়, তখন সেখানে অবশ্য-অবশ্যই বাড়াবাড়ি থাকে, কিছু বাড়াবাড়ি হয়। এটা সব সময় দেখা গেছে। এখানে পাকিস্তানীদের যে-বাহিনী এসেছিল, তার প্রত্যেকটা মেম্বার ব্যক্তিগতভাবে খারাপ লোক না। পাকিস্তানী আর্মির প্রত্যেকটা মেম্বার ব্যক্তিগতভাবে বাঙালিদেরকে ঘৃণা করে না। করে নাই। তখনও করত না। কিন্তু, তারা সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার দিকে তাকিয়ে, চাকরির অংশ হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু, বাঙালিরা পাকিস্তানী আর্মিকে যেভাবে ট্রিট করেছে, তাতে করে আর্মি তো দূরের কথা, আমাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ধারণা আছে: পাকিস্তানী-মাত্রেই খারাপ। এটা হচ্ছে ঐ বাড়াবাড়ির জায়গা। আমরা জানি ধারণাটা ঠিক না। কিন্তু,'পাকিস্তানী-মাত্রেই খারাপ' এরকম অনুভূতি হওয়ার পেছনে, এই রকম একটা বেসিক ধারণা গড়ে ওঠার পেছনে, সামাজিক-ঐতিহাসিক কারণগুলো কী— বুঝি আমরা। আমাদের প্রয়োজন এই কারণগুলো দূর করা, এক দিকে, আরেক দিকে এরকম বাড়াবাড়িমূলক ধারণাও দূর করা। বাংলাদেশের জনসাধারণ যেরকম, পাকিস্তানের জনসাধারণও সেরকম। তারা জনসাধারণ। তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে না। তারা রাষ্ট্রের নীতির শিকার হয়। তারা রাজনীতিওয়ালাদের সিদ্ধান্ত-কর্মকাণ্ডের শিকার হয়। তারা ভুক্তভোগী মাত্র। আমাদেরই মতো। [০০:৩৭:২৩–০০:৩৯:১২]

বিদ্রোহ-মাত্রেই অনেক বাড়াবাড়ি ঘটে। [সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ যে ফ্যান্টাসি কিংডমের পিকনিক নয়, তা আমাদের ভদ্রলোকদের মনে আছে বলে কোথাও দেখা গেল না।] কিন্তু, সে বাড়াবাড়িকে প্রশংসা করার যেমন বিন্দুমাত্র সুযোগ নাই, তেমনই সে বাড়াবাড়ির পিছনের কারণগুলোকে বুঝে বাড়াবাড়িকে আর বাড়তে না দেয়া, এটাই কিন্তু সকল পক্ষের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। [০০:৪৪:২১–০০:৪৪:৩৪]

তো এইভাবে, পারস্পরিক বাড়াবাড়ির ধারণাগুলো দূর করা যায়— যখন পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা থাকে, দুই পক্ষের মধ্যে যখন আলাপ-আলোচনা থাকে, যখন পরিবেশ তুলনামূলকভাবে গণতান্ত্রিক হয়, যখন বাহিনীর কাঠামোতে সিপাহীদের অধিকার, জওয়ানদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এইগুলো অফিসারদের থেকে আকাশ-পাতাল না-হয়ে যায়। তখন পারস্পরিক সমঝোতার জায়গা থাকে, তখন বাড়াবাড়ি করার, বাড়াবাড়ির মতো ঘটনা তৈরী হওয়ার, এই রকম সশস্ত্র বিদ্রোহ হওয়ার মতো পরিস্থিতি আর হয় না। [তখন পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলে সামগ্রিক সম্মতির ভিত্তিতে।] [০০:৩৯:১৩–০০:৩৯:৪১]

কিন্তু, দীর্ঘদিনের অত্যাচারের ফলে, আমরা দেখেছি, যেভাবে পাকিস্তানীদেরকে আমরা ট্রিট করেছি (যথেষ্ট কঠোরভাবে, তাদের প্রতি দয়ামায়া দেখানো হয় নি, একজন পাকিস্তানী আর্মি, একজন জওয়ান, যদি কোথাও আটকা পড়ে, তাকে মেরে ফেলতে কেউ দ্বিধা করে নি, খোঁজ নেয় নি সে ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ; অনেক

বর্বরভাবেও মারা হয়েছে; বর্বরতা তো বর্বরতাই!)—সেভাবে, বিদ্রোহ যখন হয়, গণবিদ্রোহ যখন হয়, তখন বাড়াবাড়ি ঘটে। এগুলো গণবিদ্রোহ। এগুলো ষড়যন্ত্র না। কয়েকজন লোকের কন্সপিরেসি না। কয়েকজন লোক মিলে একটা ঝামেলা পাকানো না। ক্ষমতাসীনদের মধ্যে এই অংশের ঝামেলা পাকিয়ে ঐ অংশকে বেকায়দা ফেলার মতো কোনো ঘটনা না। এই বিদ্রোহেও ও রকম বাড়াবাড়ি ঘটেছে। [উন্মত্ত জনতা কর্তৃক তাজা মানুষকে বর্বরভাবে পিটিয়ে-পিটিয়ে মেরে ফেলা, 'ডাকাত'-এর চোখ তুলে ফেলা এগুলো সমর্থনযোগ্য না-হলেও নিঃসন্দেহে ব্যাখ্যাযোগ্য। স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ-গণতৎপরতা-গণপ্রতিরোধ বাড়াবাড়ি বোঝে না। চরম বাড়াবাড়ির ফলেই বরঞ্চ তৈরি হয় এরকম চরম পরিস্থিতি।] ফরাসী বিদ্রোহের সময়ও যখন বিদ্রোহী জনসাধারণের দিক থেকে এরকম অনেক বাড়াবাড়ি ঘটে, অনেক অত্যাচার (অতি+আচার) ঘটে, তখন অভিজাতদের দিক থেকে এই যুক্তি তোলা হয়েছিল যেঃ এই জন্যই জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দিতে হয় না, তারা ক্ষমতা পেলে বাড়াবাড়ি করে, কারণ তাঁরা মুর্খ। তেমনি আমাদের বিডিআরের জওয়ানরা তো আর অফিসারদের মতো শিক্ষিত না, সুতরাং জওয়ানরা বাড়াবাড়ি করেছে। এ ধরনের যুক্তি আসে। কিন্তু, ঠিক এর উল্টো যুক্তিও থাকে কিন্তু যে, অফিসাররা অনেক বেশি শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, অনেক বেশি প্রিভিলেজড হওয়া সত্ত্বেও, অনেক বেশি সুবিবেচকভাবে বিডিআরকে পরিচালনা করেন নি যে—দীর্ঘকাল ধরে, এটা খুব পরিষ্কার। ঐ শিক্ষা, ঐ সুবিবেচনা সহকারে পরিচালনা করলে এই ধরনের গণবিদ্রোহ (যেখানে গোটা বিডিআর মনে হচ্ছে এককাট্টা) বিডিআরে তৈরী হতো না। [০০:৩৯:৪২–০০:৪১:৪৭]

[ফরাসী জনসাধারণের স্বাধীনতা ও বিপ্লবের সপক্ষে তখন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কান্ট যা বলেছিলেন তা আমি এমআইটির ইন্সটিটিউট প্রফেসর নোম চমস্কির বরাত দিয়ে তুলে ধরছিঃ

> [কান্ট] বলেছিলেন, তিনি একথা মেনে নিতে পারেন না যে, কিছু কিছু লোক, যেমন কোনো কোনো ভূস্বামীর ভূমিদাসেরা, স্বাধীনতার যোগ্য নয়। তিনি লিখছেন,
>
> > কেউ যদি এই অনুমান গ্রহণ করেন, তাহলে কোনোদিনই স্বাধীনতা অর্জিত হবে না। কেননা, স্বাধীনতার যথাযোগ্য সাবালকত্বে কেউ পৌঁছাতেই পারবেন না, যদি-না তিনি ইতোমধ্যে স্বাধীনতা অর্জন করে থাকেন। স্বাধীনভাবে নিজের ক্ষমতাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সেটা শিখতে গেলে তাঁকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে। প্রথম উদ্যোগগুলো নিশ্চিতভাবেই হবে নৃশংস এবং নিয়ে যাবে এমন পরিস্থিতির দিকে, যা হবে আগের অবস্থার চেয়ে আরো বেশি বেদনাবহ ও বিপজ্জনক—আগের অবস্থাটা বহিঃস্থ একটা কর্তৃপক্ষের আধিপত্যের অধীনে ছিল ঠিকই, কিন্তু তার তত্ত্বাবধানেও তো ছিল। যাই হোক, যুক্তি অর্জন করা যায় শুধু নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এবং সে-সব অভিজ্ঞতার দায়িত্বভার নিতে পারার জন্য তাঁকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে। অন্যের অধীনে যাঁরা থাকেন, তাঁদের জন্য স্বাধীনতা ফালতু একটা ব্যাপার এবং তাঁদেরকে স্বাধীনতা দিতে চিরকালের মতো অস্বীকার করার অধিকার কারো আছে—এই নীতি গ্রহণ করাটা খোদ ঈশ্বরের অধিকারের বিধিলঙ্ঘন বটে, যিনি তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন স্বাধীনভাবে।

> এই বিশেষ মন্তব্যটা এর পটভূমির কারণেও আগ্রহ জাগানোর মতো। ফরাসী বিপ্লবের পক্ষাবলম্বন করে এক্ষেত্রে যুক্তি দেখাচ্ছিলেন কান্ট। আর, যুক্তি দেখাচ্ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাস চলাকালে যাঁরা দাবি করছিলেন যে, ত্রাসের ঘটনাই দেখিয়ে দিচ্ছে স্বাধীনতার সুবিধাগুলোর জন্য জনগণ এখনো তৈরি নয়। এবং তাঁর মন্তব্যেরও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে আমার মনে হয়। কোনো মুক্তিপরায়ন লোকই সহিংসতা ও সন্ত্রাসকে অনুমোদন করবেন না, এবং যখন নাকি বিশেষত বিপ্লব-পরবর্তী নির্মম স্বৈরাচারের হাতে-পড়া রাষ্ট্রের সন্ত্রাস একাধিকবার গিয়ে ঠেকেছে বর্বরতার অবর্ণনীয় মাত্রায়। তবে দীর্ঘকাল যাবত দলিত জনগণ যখন তাদের নিপীড়কদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়, অথবা স্বাধীনতা ও সামাজিক পুনর্গঠনের পথে তাদের প্রথম পদক্ষেপগুলো নেয়, তখন প্রায়শ যে-সহিংসতা ঘটে, কোনো বুঝদার বা মানবিকতা-সম্পন্ন মানুষই সাত-তাড়াতাড়ি তার নিন্দা করেন না। (নোম চমস্কি, ১৯৭০)]

গণবিদ্রোহ কিন্তু কিচ্ছু দেখে না। পুঁজি এবং গণবিদ্রোহ কিচ্ছু দেখে না। রাষ্ট্র, ধর্ম, ভাষা, পবিত্রতা, জাতীয়তা, রুচি, নীতিবোধ—এগুলা কিছুই দেখে না পুঁজি। পুঁজি তার পণ্য বিক্রির জন্য, বাজার দখলের জন্য, সব কিছু করতে পারে। আর্মি নিয়োগ করে দিতে পারে। পুঁজির সপক্ষে সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করে দিতে পারে। কোনো প্লান্ডার, কোনো বর্বরতা পুঁজির জন্য কিছুই না। এরকম আর একটা জিনিস: গণবিদ্রোহ। এ-ও কোনো কিছুই দেখে না। এমন গণবিদ্রোহও হওয়া সম্ভব, যে-গণবিদ্রোহ বাংলাদেশ টিকবে কি টিকবে না তা নিয়ে কেয়ার করবে না। বাঁচার দাবি এত বড় হয়ে উঠতে পারে। আমি কাল্পনিক কথা বলছি এই মুহূর্তে। আমি সেটা চাই না। কিন্তু, বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য উপযুক্ত একটা রাষ্ট্র হিসেবেই তো বাংলাদেশকে গড়ে উঠতে হবে, বজায় রাখতে হবে নিজেকে, তাই না? তা যদি রাখতে সে না পারে, তাহলে এই রাষ্ট্রের চিরন্তন গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। ... তো, সেইদিকে যাওয়া মানেই সামাজিক স্থিতি নষ্ট হওয়া। অহেতুক রক্তপাত করা। আমরা মানুষ—বিবেচনা-সম্মত প্রাণী। মানুষ যদি চায়, তাহলে পরে সে বিবেচনার মধ্য দিয়ে, বুদ্ধি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে, ভালোবাসা ও দরদের মধ্য দিয়ে, সমাজের সমস্যাটার সমাধান করতে পারে। [০১:২১:৪৭–০১:২৩:১৫]

[যদি কোনো ব্যক্তি এমনকি 'অসৎ' বলে যদি প্রমাণিতও হন, তবু তাঁদেরকে এরকমভাবে মেরে ফেলার পক্ষে সভ্য মানুষের কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। তাহলে বিদ্রোহীরা এরকম রক্তক্ষয়ের দিকে গেলেন কেন? বিদ্রোহে রক্তক্ষয় করা কি খোদ বিদ্রোহের জন্যই মঙ্গলজনক? তাতে কি আসল উদ্দেশ্য অর্জন করাটা সহজ হয়? এটা বোঝা কি তাঁদের জন্য অসম্ভব ছিল যে, এই অফিসার-নিধন তাঁদের বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্যকেই বিনষ্ট করে ফেলবে?

যতই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হোক, বলপ্রয়োগের চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি হয়েছে, যেটি না করলেও তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য পূরণ করতে পারতেন। সেনা অফিসারদের মেরে না ফেলে জিম্মি করলেও তাঁদের দাবিদাওয়া পূরণ হতো।

তবু তাঁরা কেন এটা করলেন? তাঁরা কি স্বভাবতই—জন্মসূত্রেই—বিচারবুদ্ধিহীন, হিংস্র, রক্তলোলুপ প্রাণী? পরিণাম যা-ই হোক, একগাদা অফিসারকে বর্বরের মতো

মেরে ফেলাই কি এই প্রাণীদের পরম প্রার্থিত ছিল? তা কী করে হয়? সারা দেশে বিদ্রোহের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা ও গণচরিত্র এরকমটা বলে না—ওপরে তা আমরা দেখিয়েছি।

তাহলে কী একেবারে শুরুর দিকে অফিসারদের দিক থেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এক-আধজন কেউ নিজেদের জান বাঁচাতে গুলি ছুঁড়েছিলেন, যা জওয়ানদেরকে সুতীব্র মানসিক চাপের ঐ মুহূর্তে একেবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করে তুলেছিল? নাকি. এরকম ঘটনা *আদতে* না-ঘটলেও কোনো-না-কোনোভাবে এরকম একটা 'সংবাদ' রটে গিয়েছিল? প্রথমেই ডিজিকে বন্দুক তাক-করা জওয়ানটি যে এক প্রকার নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন, সেই ঘটনাটিই কি "একজন জওয়ানকে অফিসাররা গুলি করে মেরে ফেলেছে" বলে গুজব ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল? পারস্পরিক অবিশ্বাসের চূড়ান্ত মুহূর্তে এরকমটা ঘটাও যে অসম্ভব নয়, তা বোধগম্য।

এক্ষেত্রে বরং বিডিআর-জওয়ানদের কঠোর প্রশিক্ষণ-অনুশীলন ও কর্ম-পরিচালনা-প্রণালী তাঁদেরকে কতটা মানবিক বোধবুদ্ধিসম্পন্ন করে গড়ে তোলে, এই প্রশ্নই ওঠে। এঁদের বিদ্রোহে যে বলপ্রয়োগের বাড়াবাড়ি ঘটবে, তাতে আমরা সরল মনে বিস্মিত হতে পারি ঠিকই, কিন্তু আমাদের যেসব আত্মীয়স্বজন-ভাইবেরাদর-সন্তানকে আমরা ভালোবাসা-কোমলতা-মানবিকতা শেখাইনি, এখন নিদানকালের

জীবনমরণ-সংকটে এসে ঐসব মধুর আচার-অনুভূতি তাঁদের কাছ থেকে আশা করা কি যথেষ্ট বিবেচনাসম্মত? তাঁরা কি তাঁদের অফিসারদের কাছ থেকে 'মানুষের মর্যাদা' পেয়ে থাকেন, নাকি দাস-জনোচিত ভালোমন্দ পেয়েই তাঁরা অভ্যস্ত? অফিসারদের আচার-আচরণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা না-তুলেও এ-প্রশ্নটাকে সামনে নিয়ে আসা যায়: এক্ষেত্রে বিডিআরের মতো একটা সামরিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম-প্রশিক্ষণ-কাঠামো কতটা 'মানবিক'? জওয়ানদের মানবিক গুণাবলীর নিরন্তর বিকাশের উপযোগী পরিবেশকে কি তা একান্ত ভালোবাসা ও যত্নের সাথে লালনপালন করে? নাকি তা অন্ধের মতো নির্বিচার আদেশ-পালন, যেকোনো পরিস্থিতিতে 'শত্রুকে' খুন করার স্পৃহা এবং যান্ত্রিক শৃঙ্খলার রোবট-সত্তাকে উৎসাহিত করে?

রাষ্ট্রের সামরিক-বেসামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমাগতভাবে সহিংস হয়ে ওঠা, এবং সমাজের শিক্ষা-বুদ্ধিবৃত্তি-সংস্কৃতির সাথে জড়িত বুদ্ধিনেতাদের তাতে অব্যাহত সমর্থন যুগিয়ে চলার পরিণামে, তথা রাষ্ট্রের সার্বিক

> এই শিলীভূত সহিংসতা-সিস্টেমের প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে 'শান্তিবাদের অসুখ'। সামাজিক ধারণাকাঠামোর বাইরে দেখতে পান না শান্তিবাদী। ফলে, তিনি সৃষ্টি করেন মিথ্যা একটা দ্বৈততা। সহিংসতার প্রশ্নটাকে তিনি পরিসীমিত করে ফেলেন নৈতিক/বুদ্ধিবৃত্তিক পছন্দ-অপছন্দের সীমায়। এবারে, হয় আপনাকে সহিংসতাকে শিলীভূত একটা সিস্টেম বলে স্বীকার করতে হবে, না-হয় তো পুরো জিনিসটাকেই প্রত্যাখান করতে হবে। কিন্তু, এই পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটার অস্তিত্ব থাকে শুধুমাত্র মূল্যহীন বিমূর্ত জগতেই। সত্যিকারের যে-পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সেখানে শান্তিবাদ এবং সিস্টেমেটিক সহিংসতা একে অন্যের ওপর ভর করে চলে। ... আমরা যারা জীবনকে নিজেদের মতো করে বানিয়ে নেওয়ার লড়াই করছি, আমাদের উচিত হবে উভয় পক্ষকেই প্রত্যাখান করা। (ফেরাল ফন, ১৯৯২)

দস্যুর দাপট এবং সম্রাটের সন্ত্রাসের খপ্পর থেকে বেরুনোর এ ছাড়া পথ নেই। কেননা, রাষ্ট্রীয়-সামাজিক আয়োজনে গড়ে তোলা এরকম

> যুক্তিনির্ভর সহিংসতা-সিস্টেম সুদীর্ঘকাল ধরে নিজেকে টিকিয়ে রেখেই ক্ষান্ত হয় না, খুঁচিয়ে বের করে আনে সহিংসতার জবাবটাকেও। প্রায়শই তা বেরিয়ে আসে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিবর্গের অন্ধত্বপূর্ণ চাবুক-কষানোর রূপ ধারণ করে। সার্বিক রাষ্ট্রীয়-সামাজিক সিস্টেম তখন একে কাজে লাগায় তার নিজের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার অজুহাত হিসেবে। জবাবটা কখনো-কখনো সচেতন বিদ্রোহজনিত সহিংসতার রূপও ধারণ করে। (ফেরাল ফন, ১৯৯২)

অত্যন্ত সফলভাবে শুরু হওয়া বিডিআর-বিদ্রোহের গ্লানিময় পরিসমাপ্তির ক্ষেত্রেও অহেতুক রক্তক্ষয় ও সহিংসতার এই প্রশ্নটিকে বিশেষভাবে খেয়াল না-করে পারা যায় না। বিদ্রোহীদের অপরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি খোদ বিদ্রোহটাকেই দুঃখজনকভাবে আড়াল করে দিয়েছে; গায়েব করে দিয়েছে প্রায়।

বিদ্যমান ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর যাঁরা চান, তাদের সংগঠিত চ্যালেঞ্জ-প্রতিরোধ-বিদ্রোহ-সংগ্রাম ইত্যাদি যদি প্রাণঘাতী সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয় (যেমন লালপতাকা জনযুদ্ধ সর্বহারা পার্টি প্রভৃতি মাওবাদী সমাজতান্ত্রিক ধারা,

জেএমবি হিজবুত তওহিদ হুরকাতুল জিহাদ প্রভৃতি ইসলাম-নামাঙ্কিত শক্তি, কিংবা আমাদের বিডিআর-বিদ্রোহীরা), তবে তা রাষ্ট্রীয়-সামরিক-আইনশৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে বিদ্রোহীদের ওপর অকল্পনীয় বলপ্রয়োগ করার সুযোগ/উসিলা তুলে দেয়। সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিবেদিত যাবতীয় খুচরা ভায়োলেন্স কর্তৃত্বের সামগ্রিক ভায়োলেন্স-চর্চাকে অনায়াস বৈধতা দেয়। এতে করে বিদ্যমান নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা শত গুণে বেড়ে যায়।

সুতরাং, বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থায়, সফল সামাজিক বিদ্রোহের একটা মূল চাবিকাঠি হচ্ছে সামাজিকভাবে 'অহিংস প্রতিরোধ'-আন্দোলনের পথে যথাসম্ভব বিপুল জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার ধারায় অগ্রসর হওয়া। এটা এমন একটা পথ যা নিরস্ত্র-কিন্তু-প্রতিরোধনিষ্ঠ জনসাধারণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সমর্থনশূন্য, দ্বিধান্বিত ও বিপন্ন করে তোলে।]

৩.৭ বিদ্রোহের বৈধতা ও ন্যায্যতার প্রশ্ন

[বিদ্রোহ মানে কর্তৃত্বের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা, প্রশ্নবিদ্ধ করা, অবৈধ প্রতিপন্ন করা। বিদ্রোহ মানে কেন্দ্রীভূত ও আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতাবিন্যাসের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগতভাবে বা সংগঠিত উপায়ে তৎপরতা চালানো। বিদ্রোহ মানে ব্যক্তির স্বরাজ ও স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য সদাজাগ্রত ও সদাতৎপর থাকা। বিদ্রোহ মানে তাহলে প্রতিরোধ। ব্যক্তির দিক থেকে প্রতিরোধ। এবং সমাজের দিক থেকে প্রতিরোধ। প্রতিরোধ রাজনীতির বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। রাজ নৈতিক প্রতিরোধের ঘটনাও ঘটতে পারে, তবে সেটা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাতন্ত্রকে নিজেদের দখলে আনার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত, ক্ষমতার হাত-বদলের লক্ষ্যে পরিচালিত। এই অর্থে বিদ্রোহ মাত্রেই সামাজিক। এবং এই অর্থে] সকল বিদ্রোহই ন্যায়সঙ্গত।

সমাজের মধ্যে যত রকমের জড়তা, যত রকমের দ্বিধা, যত রকমের পশ্চাৎপদতা, যত রকমের অচলায়তন—এগুলোকে বিদ্রোহই ভাঙ্গতে পারে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, কবিতায়, নাটকে, চালচলনে, কৃষিতে, বাণিজ্যে, কত রকমের টেকনোলজিতে, বিজ্ঞানে—কত রকমের বিদ্রোহ, কত রকমের বিপ্লব, কত রকমের পরিবর্তন, এগুলোই

কিন্তু পৃথিবীকে যুগে-যুগে এগিয়ে নিয়ে যায়; অচলায়তনকে ভেঙে সমাজকে নতুন করে প্রাণ-সঞ্চারিত করে।[২১] [০০:৪১:৪৮–০০:৪২:৩৯]

ফলে, সমস্ত বিদ্রোহই ন্যায়সঙ্গত। [০০:৪৪:১৪–০০:৪৪:২০]

একটা সমাজে যদি বঞ্চনা থাকে, বৈষম্য থাকে (যেকোনো পাত্রতেই হোক), তাহলে কখনো-না-কখনো বিদ্রোহ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এবং সমাজে নিজেদের অস্তিত্বের সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে এই বৈষম্যগ্রস্ত (তথা বৈষম্যের শিকার) এবং বঞ্চনাকারী পক্ষগুলোর মধ্যে সারা বছর ধরেই একটা ধরনের মনঃস্তাত্ত্বিক যুদ্ধাবস্থা, এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা, এক ধরনের পারস্পরিক বিরোধিতা, দ্বন্দ্ব, বড় সংঘাত তৈরী হওয়ার মতো একটা পাতা-ফাঁদ সবসময়ই তৈরী হয়ে থাকে। ফলে, বৈষম্যমূলক সমাজে, যেখানে ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, বাঁচার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তগত সুযোগসুবিধাগুলো ব্যাপক বঞ্চনামূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, সেখানে বিদ্রোহ কাম্য, সেখানে বিদ্রোহ অনিবার্য। সেখানে বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত আটকে রাখা যায় না। [০০:৪৪:৩৪–০০:৪৫:৩৫]

বিদ্রোহই মানুষের স্বাধীনতার সীমা বাড়ায়। অচলায়তন মানুষের স্বাধীনতার সীমা কমায়। বিদ্রোহ-মাত্রেই ন্যায়সঙ্গত। বিদ্রোহ-মাত্রেই বৈধ। কর্তৃত্ব-মাত্রেই অন্যায়। কর্তৃত্ব-মাত্রেই অবৈধ। এটা সমাজের সাধারণ ধর্ম: আমি বলছি বলে না; মানুষ এভাবেই দেখে। এতগুলো লোককে বিডিআরের জওয়ানরা খুন করেছে, অথচ সাধারণ

---

[২১] **সেনাবিদ্রোহ ও মুক্তিসংগ্রাম**: আমাদের নিজেদের ইতিহাসের কথা বলতে গেলে, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথাই বলা যায়। ১৯৭১-এ আমাদের সেনাবাহিনী এবং তারও আগে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্ বা ইপিআর (বর্তমানে বিডিআর) নিজ নিজ বাহিনীর হুকুম-শৃঙ্খলা বা চেইন-অফ-কমান্ড ভেঙে ফেলে সুতীব্রভাবে আক্রমণাত্মক বিদ্রোহ গড়ে তুলেছিল হাজারে হাজারে নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের সেক্রেটারি মঈদুল হাসান সম্প্রতি পরিষ্কার বলেছেন, "... বাংলাদেশের সর্বত্র পুলিশ, ইপিআর, আনসার ও সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষত বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সদস্যরা একযোগে বিদ্রোহ করেন; যদিও পরবর্তীকালে এটা বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের আহ্বানে তারা বিদ্রোহ করে যুদ্ধে নেমেছে, এটা অসত্য। আসল ঘটনা হলো ... আক্রান্ত হওয়ার পর তারা বিদ্রোহ করেছে।" (এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান এবং এস আর মীর্জা, ২০০৯: ১০) আমাদের টংক বিদ্রোহ, নানকার বিদ্রোহ, তেভাগা বিদ্রোহসহ আক্ষরিক অর্থেই অজস্র কৃষক বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, পাগল বিদ্রোহ, সন্ন্যাস বিদ্রোহ, কৈবর্ত বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, অনুশীলন, যুগান্তর ইত্যাদির ইতিহাসই বাঙালির মুক্তির ইতিহাস। সারা পৃথিবীতেই তাই। মার্কিনী গণতন্ত্রের যেটুকু সুফল সারা বিশ্ব আজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাচ্ছে, তার সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠাও স্বাধীনতা-অভিমুখীন 'মার্কিন মহাবিদ্রোহ' এবং শত শত দাসবিদ্রোহের মধ্যে:

> ১৭৭৬ সালের 'স্বাধীনতার মার্কিন ঘোষণা' রচিত হয়েছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি-বিরোধী বিদ্রোহীদের দ্বারা। এই ঘোষণায় আছে কতকগুলো 'অপরিহার্য অধিকার' এর কথা। তার ভেতরে আছে 'জীবন, স্বাধীনতা, ও সুখ-অভিলাষ' এর অধিকার। আর আছে প্রতিরোধের অধিকার। 'অপরিহার্য অধিকার'সমূহ লঙ্ঘনকারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অধিকার: "সরকারের অবয়ব যা-ই হোক না কেন, যদি কোনো সরকার এই সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, তবে তাকে সরিয়ে দেওয়া বা বিলুপ্ত করা জনসাধারণের অধিকারের মধ্যে পড়ে ..."। (Mac Manus Patrick, 2010)

মানুষ বলছে না বিডিআর খুনি, ওদের বিচার হওয়া উচিত। তার মানে: সমাজের ধর্ম দেখতে পাচ্ছি আমরা। আমার বক্তৃতা শুনে তো আর সমাজের কেউ সিদ্ধান্ত নেয় নি! সমাজের ধর্মই হচ্ছে বিদ্রোহকে ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকৃতি দেয়া।[২২] [০০:৪৫:৩৬–০০:৪৬:১৬]

এই যে আমাদের সুশীল সমাজ, যে-সুশীল সমাজ এত বেশি প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে বিদেশী পুঁজি এবং জণবিচ্ছিন্ন পুঁজির পক্ষে, অর্থনৈতিক বঞ্চনার পক্ষে, কত রকমের যে তারা অগণতান্ত্রিক (জনগণের স্বার্থের বিরোধী) সিদ্ধান্ত-প্রোপাগান্ডায় লিপ্ত থাকে, কিন্তু তাদেরকে পর্যন্ত আমরা দেখেছি, গতকালকের শুরু থেকেই এটাকে 'বিদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করতে। এবং এটাকে 'বিদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করার মধ্য দিয়েই এই বিদ্রোহ যে ন্যায়সঙ্গত সেটা প্রমাণিত হয়েছে। সেটা পষ্ট হয়ে উঠেছে। [০০:৪৬:১৭–০০:৪৬:৫০]

[এই বিদ্রোহ যে আপামর গরিব মানুষের সহানুভূতিও অর্জন করেছিল, সেটা ঐ কয়দিন সারা দেশের সাধারণ মানুষের কথাবার্তায়, আড্ডায়, চায়ের দোকানে, রিকশাওয়ালার কথোপকথনে দিব্যি বোঝা গেছে। আমি এই দুই দিন অনেক মানুষের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেছি। তাতে এরকমই বোঝা গেছে।]

৩.৮ বিদ্রোহ হয় কেন?

তাহলে, সমাজের জন্য প্রার্থিত/কাঙ্ক্ষিত দুইটা পথ: হয় বিদ্রোহ, না-হয় স্বাধীনতা। কর্তৃত্ব → বৈষম্য → বঞ্চনা → বিদ্রোহ → স্বাধীনতা → সমতা: এটা সমাজের অগ্রগতির জন্য স্বাভাবিক পন্থা।[২৩] যদি স্বাধীনতা থাকে, তাহলে বিদ্রোহের প্রয়োজন পড়ে না। যদি স্বাধীনতা না-থাকে, তখন স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই বিদ্রোহের প্রয়োজন পড়ে। স্বাধীনতা এবং সমতা: বিডিআর-জওয়ানরা দুই কথাই বলেছেন। তাঁরা স্বাধীনতার কথা বলেছেন–সেনাবাহিনীর হাত থেকে, সেনা-অফিসারদের হাত থেকে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিডিআরের স্বাধীনতা, বিডিআরের মর্যাদা। আরেক দিকে অর্থনৈতিক

---

[২২] সমাজের জন্য বিদ্রোহচেতনা মঙ্গলজনক, কিন্তু সামরিক বাহিনীর জন্য এটা অমঙ্গলজনক, সর্বোচ্চ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিদ্রোহ আইনত প্রত্যাশিত।

[২৩] **'স্বাভাবিক বিশুদ্ধি'র নীতি**: *শিবপুরাণ*-কথিত 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধি'র নীতি স্মর্তব্য। "এই পৃথিবীর অস্তিত্বের সাথে বিশুদ্ধির এই নীতি ওতপ্রোত। এই নীতি অনুসরণ করেই জড়জগত বিকাশ লাভ করে চলেছে; চিন্তক জীব রূপে মানুষের উৎপত্তি যার অন্যতম প্রকাশ। ... মানুষ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বিধায় তার স্বভাবের মধ্যেই এই নীতি অনুসরণের স্বাভাবিক প্রবণতাও বিদ্যমান। ... স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নীতি পূর্ববিধান অস্বীকার্য নয়, কিন্তু স্বাধীনতার দাবিও স্বীকার্য। এই নীতি অনুসরণ করলে কর্মক্ষেত্রে 'পূর্ববিধান ও স্বাধীনতার দ্বৈরাজ্য' (রবীন্দ্রনাথ) চলে। পূর্ববিধান যেখানে যতখানি অক্ষম, স্বাধীনতা সেখানে ততখানি নববিধানের উদ্ভাবন করে বসে। উভয়ে মিলে মিশে নতুন বিধান প্রসূত হয়, পরবর্তী কার্যক্ষেত্রে সেটাই পূর্ববিধানের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। স্বাধীনতার সুযোগে, প্রয়োজনে, পুনরায় নববিধানের জন্ম হয়; চক্রটি চলতে থাকে। ফলত কর্মনীতি ও কর্মফলে নিত্যবিশুদ্ধিও চলতে থাকে। মানুষ আরও সঠিক, আরও নিখুঁত, আরও সুন্দরের টানে এগোতে থাকে।" (কলিম খান, ১৯৯৫: ১৬–১৮) সমাজের এই স্বাভাবিক নীতি অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হতে ব্যর্থ হলে বিদ্রোহ অপরিহার্য। 'সুন্দরের টানে'ই বিদ্রোহ করে মানুষ।

বঞ্চনা এবং নিপীড়নের হাত থেকে তাদের মুক্তি। সমতা এবং স্বাধীনতা—এর জন্যেই কিন্তু বিডিআরের এই বিদ্রোহ। সমাজের মধ্যে এই কারণেই বিদ্রোহ ঘটে। [০০:৪৭:২৭–০০:৪৮:২০]

বিদ্রোহ ঘটে—যখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধান করার কোনো পথ খোলা রাখা হয় না। সুতরাং, বিদ্রোহের মূল উস্কানিটা দেয় কর্তৃত্ব। যখন কর্তৃত্ব—সব ধরনের কর্তৃত্ব, বিশ্ববিদ্যালয়-সিন্ডিকেটের কর্তৃত্ব, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার কর্তৃত্ব, পরিবার পরিচালনার কর্তৃত্ব, বা সামরিক বাহিনীগুলোর কর্তৃত্ব—যখন তার অধীনস্ত লোকদের সমস্যা, বৈষম্য, অসমতা, বঞ্চনার বোধ, অ-স্বাধীনতার (মানে পরাধীনতার) বোধ, মর্যাদার বোধ এগুলোকে নিয়ে সৃষ্ট সমস্যাগুলোকে বিচার-বিবেচনা করেন না, সেগুলো সমাধানের জন্য স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পথ খোলা রাখেন না, তখন তাঁরাই বিদ্রোহের মূল উস্কানিটা দেন। বিদ্রোহের মূল জমি তাঁরাই তৈরী করেন। কর্তৃত্বই তৈরী করে। আর যদি ওই রকম পথ কর্তৃত্ব খোলা রাখে, বঞ্চনা, বিক্ষোভ এগুলো তাহলে এরকম বিদ্রোহের দিকে যায় না। [০০:৫০:১৬–০০:৫১:১৮]

৩.৯ বিডিআর-বিদ্রোহের প্রকৃত গুরুত্ব

[বিডিআর-বিদ্রোহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা এই কারণে নয় যে: বিদ্রোহীরা ৫৮ জন 'দেশপ্রেমিক' সেনা-অফিসারকে চরম নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছেন, এবং লাশগুলো ড্রেনে ফেলে দিয়েছেন এবং গণকবরের মতো করে মাটিচাপা দিয়েছেন। কেননা, খুনোখুনি ও নিষ্ঠুরতার ইতিহাস খোদ সশস্ত্রবাহিনীতেই শিউরে ওঠার মতো মাত্রায় আছে। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেও নয় যে: রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগকারী একটি বাহিনীর ভেতরকার সামগ্রিক শৃঙ্খলা-বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। কেননা, সামরিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা কঠিন কিছু না। বরং, আমাদের রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের সংস্থা/বাহিনীসমূহের বিদ্যমান অগণতান্ত্রিক, জবরদস্তিমূলক, গণবিচ্ছিন্ন, এলিটিস্ট, আমলাতান্ত্রিক উপরনিচকাঠামোওয়ালা বৈশিষ্ট্যসমূহ পুনর্বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি। কিংবা, এই কারণেও গুরুত্বপূর্ণ নয় যে: আমাদের সুবিস্তৃত ভারত-সীমান্ত ও সংক্ষিপ্ত মায়ানমার-সীমান্ত অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। কেননা, ভারত-মায়ানমার আগ্রাসী হয়ে উঠলে জনসাধারণের গণপ্রতিরোধ ছাড়া সীমান্ত বাঁচানোর আদৌ কতটুকু সুযোগ আছে, তা অবোধগম্য নয়।

বিডিআর-বিদ্রোহ যে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, তার প্রধানতম কারণ: এটা আসলে বিদ্রোহ, খাঁটি একটা গণবিদ্রোহ; তা-ও আবার সামরিক শৃঙ্খলা-সম্পন্ন একটা বাহিনীতে; এবং তারও ওপর এই দ্রোহের দ্যোতনার সাথে প্রধানত গরিব, এবং স্বতঃস্পষ্টত আপামর, জনসাধারণের তাৎক্ষণিক একাত্মতাবোধ মোটেও অপ্রকাশিত ছিল না। অল্প কিছু ষড়যন্ত্রীর রাষ্ট্রবিরোধী নাশকতার ঘটনার মতো সামান্য ঘটনা এটা নয়। কতিপয়ের রাষ্ট্রবিরোধী নাশকতা ফৌজদারি/সামরিক কায়দায় দমন করা যায়—অসামান্য ব্যাপার নয়। (যেমন প্রতিদিন 'জঙ্গি'-দমন চলছে। যেমন 'চরমপন্থী'-নিধন চলছে। কিন্তু, কোনো গণবিদ্রোহকে ওরকম পন্থায় মোকাবেলা

করতে গেলে খোদ সমাজব্যবস্থাটাই আখেরে/আশু অনিরাপদ হয়ে পড়ে। সর্বব্যাপী মহামগজ-ধোলাইয়ের এই যুগে বিদ্রোহ নিজেই বরং সবচেয়ে জরুরি প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে। গণবিদ্রোহ সামাজিক পরিবর্তনের একটা প্রক্রিয়া বৈকি ! বিদ্রোহ গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য নয় যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিবর্তনের চেয়ে রক্তপাত-খুনোখুনি-হিংসা শ্রেয়তর। বিদ্রোহ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা আমাদের জানায় যে সমাজের সুস্থ প্রবহমানতা ও সজীব পরিবর্তমানতার সামাজিক ধারা আর অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হতে পারছে না। কানাগর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে নদী। ঘোলা হচ্ছে জল, আর প্লাবনে-কাদায়-মারীতে ডুবছে দেশ। এই বিদ্রোহ বলে গেল: এক্ষুণি উপযুক্ত বাঁক না-নিলে সামনেই সমূহ সর্বনাশ, অপেক্ষাতে আরো অন্ধকার।]

মাঝেমধ্যে একটু-আধটু বিদ্রোহ ঘটা ভালো। রাজনৈতিক জগতের জন্য এটা প্রয়োজনীয়ও বটে, প্রাকৃতিক জগতের জন্য প্রয়োজন যেমন ঝড়।... সরকারের সুস্বাস্থ্যের জন্য এটা একটা ওষুধ।

টমাস জেফারসন[২৪], ১৭৮৭

কথকতা চার

বিদ্যমান রাজনৈতিক গণতন্ত্র: শক্তি ও সীমাবদ্ধতা

প্রধানমন্ত্রী চমৎকার দরদ নিয়েই বলেছেন, স্বজন হারানোর বেদনা উনি জানেন। ফলে, সারাদেশের যে-লোকেরা স্বজন হারালো—ছোট বাচ্চা, বেসামরিক সাধারণ লোক, বিডিআরের জওয়ান, সেনাবাহিনীর অফিসার—তাদেরকে তিনি ধৈর্য ধরতে বললেন। এই দরদটা আমাদের দরকার। সমস্ত কর্মকাণ্ডে— মিডিয়ার, জনগণের, এবং সবার। [১:৩২:২১–১:৩২:৫২]

৪.১ আলাপ-আলোচনা-সমঝোতার পথ

এই প্রথম রাজনৈতিক গণতন্ত্র, যেটুকু গণতান্ত্রিক হতে পারে, তার কিছু নমুনা আমরা দেখতে পেলাম। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ধারণা এমনিতে খুব সীমিত। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কাছ থেকে দেশের আপামর মানুষ তাদের মুক্তির জন্য তেমন কিছুই তো আশা করতে পারে না। রাজনৈতিক গণতন্ত্র খুব পরিষ্কারভাবেই বড় পুঁজির এবং বড়লোকদের পক্ষে পরিচালিত একটা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া খুব সীমিত। এই প্রক্রিয়ার কাছ থেকে জনসাধারণ খুব বেনিফিট পায় না। [০০:৫৭:৩৫–০০:৫৮:০৫]

এত সীমিত, এত সংকীর্ণ একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যেটুকু 'গণতান্ত্রিক' হয়ে উঠতে পারে, যেটুকু গণতান্ত্রিক চেতনা, যেটুকু গণতান্ত্রিক ধারণা, আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করতে পারে, তার একটা বড় প্রদর্শনীই আমরা দেখেছি এই সরকারের দিক থেকে। এরা অত্যন্ত বিবেচক, অত্যন্ত বিজ্ঞ পথে গেছে। বলতে গেলে একমাত্র সমাধান হচ্ছে আলোচনা, সমঝোতা। সেই পথেই তারা গিয়েছে। কালকে যখন আইএসপিআর একটা বিবৃতি[২৫] পাঠালো, মানে সামরিক বাহিনীগুলোর আন্তঃদপ্তরগুলো থেকে একটা

---

[২৪] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বাধীনতার ঘোষণা'র আদি রচয়িতা ও ভবিষ্যত-রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসন কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যত-রাষ্ট্রপতি জেম্‌স্‌ ম্যাডিসনের কাছে ১৭৮৬–১৭৮৭ সালের 'শেইয়েজ বিদ্রোহ' প্রসঙ্গে লেখা চিঠি। ৩০শে জানুয়ারি ১৭৮৭ তারিখে এই চিঠি লেখার সময় জেফারসন ছিলেন প্যারিসে, কূটনীতিবিদ হিসেবে কর্মরত। আর, ম্যাডিসন তখন 'মহাদেশীয় কংগ্রেস'-এর কংগ্রেস-প্রতিনিধি। মার্কিন মহাদেশের ১৩টি রাজ্যের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে 'মহাদেশীয় কংগ্রেস' পরিগঠিত হয়েছিল বৃটেনের নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে।

[২৫] **আইএসপিআর-বিবৃতি**: 'ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্স', তথা সশস্ত্রবাহিনীর আন্তঃবাহিনী-জনসংযোগ-দপ্তর। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট মোতাবেক, আইএসপিআর-এর কর্তব্যসমূহের মধ্যে আছে: প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করা; সশস্ত্রবাহিনীসমূহের একমাত্র এজেন্সি হিসেবে বাহিনীর প্রতিষ্ঠান-সংস্থা-কার্যালয়সমূহের কার্যক্রমের প্রচারণা চালানোর পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করার কাজ করা; এবং প্রয়োজনে সশস্ত্রবাহিনীসমূহের পক্ষে মনঃস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনা করা (http://www.mod.gov.bd/services.html)। [এই তথ্য ২৫শে নভেম্বর ২০০৯ তারিখে ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত হয়েছে।] বাসস-এর বরাত দিয়ে ইংরেজি দৈনিক *নিউএজ*

বিবৃতি গেল, সেই বিবৃতিতে হুঁশিয়ারির টোনটা খুব স্ট্রং ছিল। কিন্তু সরকার সে পথে যায় নি। আমরা জানি না আইএসপিআর-এর বিবৃতিটার কতটুকু সামরিক কর্মকর্তাদের বিবৃতি, আর কতটুকু সরকারের বিজ্ঞপ্তি। [০০:৫৮:০৬–০০:৫৮:৫৮]

হেলিকপ্টার নিয়োগ করা, বিডিআরের জায়গাটা ঘিরে ফেলা, ভারী অস্ত্র মোতায়েন করা—এগুলো হচ্ছে যে ঐ সংঘাতপূর্ণ পদ্ধতিরই লক্ষণ ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং তার সরকার যথেষ্ট বিবেচনার পথে গেছে। সবসময়ই সমাজে যেকোনো বড় সংকট নিরসনের পথ হচ্ছে আলাপ-আলোচনা, সমঝোতা, লেনদেন এবং সবার সিদ্ধান্ত। [০০:৫৮:৫৯–০০:৫৯:৩২]

৪.২ সামরিক আক্রমণে না-যাওয়া

আরো তিন দিন ওয়েট করতে হলেও সামরিক আক্রমণের দিকে যাওয়া ঠিক হবে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, তার অখণ্ডত্ব, তার সার্বভৌমত্ব নিয়ে ঝামেলা তৈরী হয়ে যাবে। গোটা দেশ বিভক্ত হয়ে যাবে। ঘরে ঘরে সামরিক বাহিনীর আত্মীয়স্বজন আছে; ঘরে ঘরে বিডিআরের আত্মীয়স্বজন আছে। এখানে রক্তাক্ত সমাধানের দিকে যাওয়া মানেই হচ্ছে *খুব ভয়ঙ্কর* জায়গায় গোটা সমাজ চলে যাওয়া। [০০:৫৯:৩৩–০১:০০:৪৬]

তাহলে বিদ্রোহ কতখানি রক্তক্ষয়ী হয়ে উঠবে, এটা ডিপেন্ড করে বিদ্রোহ যাঁরা দমন করতে চান, তাদের প্রস্তুতির উপরে। যখন হেলিকপ্টার টহল দিয়েছে, যখন চারিদিক দিয়ে সেনাবাহিনী ঘেরাও করেছে, র‍্যাব ঘেরাও করেছে, তখন ভেতর থেকে গোলাগুলি অনেক বেশি বেড়েছে। তখন ভেতরে—অনুমান করা যেতে পারে, কমন সেন্স থেকে—যে, ভেতরে তখন হয়ত সহিংসতা আরো বেশি বেড়েছে। তখন তারা আরো বেশি থ্রেটেন্ড্ ফিল করেছে। তারা অনেক বেশি বিপদ বোধ করেছে, হুমকি বোধ করেছে। [০১:০১:৩১–০১:০২:০৪]

৪.৩ রাষ্ট্রকে বিডিআর-জওয়ানদের আস্থা অর্জন করতে হবে

তাহলে, প্রথমত, বঞ্চনার সমাধান সমাজ কতটুকু গণতান্ত্রিকভাবে করে—মানে কর্তৃত্ব/কর্তৃপক্ষ কতটুকু গণতান্ত্রিকভাবে করে—তার উপর নির্ভর করে যে, বঞ্চনার প্রকাশ কেমন হবে—বঞ্চনা অনুভূতির প্রকাশ; দ্বিতীয়ত, একবার বঞ্চনা থেকে ব্যাপক বিদ্রোহে চলে গেলে, সেই বিদ্রোহকে ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে কতটুকু বলপ্রয়োগ করার হুমকি বা অবস্থা তৈরি করা হবে, তার উপরে নির্ভর করে যে, বিদ্রোহ কত রক্তক্ষয়ী হয়ে ওঠে। তাইলে, কোনো পরিস্থিতিতেই বলপ্রয়োগের দিকে যাওয়া যাবে না। শেখ হাসিনা যে-হুমকিটা দিয়েছেন, সেই হুমকিটা তার দিক থেকে দেওয়ার একটা কর্তব্য থেকেই যায়, কেননা, সবাই একদম দিশেহারা যেন হয়ে না-পড়ে। কারণ, বিডিআরের

আইএসপিআর-বিজ্ঞপ্তির খবরটা ছাপে। 'দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং বিডিআরের শতবর্ষী গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার দোহাই' দিয়ে সকলকে গোলাগুলি থামানোর আহ্বান জানিয়ে আইএসপিআর-বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়: "এই আহবানের পরও যদি তোমরা কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নাও, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।" (নিউএজ, ২০০৯)

যে-জওয়ানরা ওখানে এই মুহূর্তে আছে, তারা তো প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে আছে। ঐ মানসিক চাপে মানুষ সব সময় হিতাহিত জ্ঞান বজায় রাখতে পারে না। পরিস্থিতি সেই দিকে যেন না যায়। ফলে, সেই হুমকিটা তারা দিতে পারে, কিন্তু হুমকিটার থেকেও জরুরি হচ্ছে, জোর দিতে হবে আলোচনার ওপর। বিডিআরের জওয়ানদের আস্থা অর্জন করতে হবে—রাষ্ট্রকে। এটাই সমাধানের পথ। [০১:০২:৩০–০১:০৩:৪২]

আমার তো মনে হয়—শেখ হাসিনা সশরীরে হাজির হয়ে যেতে পারতেন বিডিআরে—শুরুতেই[২৬]। আমি জানি না, আমি ঠিক কিনা। হতে পারতো। এবং খুব সহজেই জওয়ানদের সঙ্গে আলোচনা করে, তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে, সেখানে নতুন একজন ডি.জি. নিয়োগ করে এই সমস্যাটা সমাধান করা, তখনই সারেন্ডার করানো, সেটা সম্ভব হতো এবং সেনা-জওয়ানরা নিজের নিজের ব্যারাকে ফিরে যেত। [০১:০২:০৫–০১:০২:২৯]

৪.৪ বিরোধী দলের বিবেচনাপূর্ণ বিবৃতি

খুবই উল্লেখযোগ্য, মাঝখানে বলে রাখি, ভুলে যেতে পারি পরে যে: বিরোধী দলের যে-

---

[২৬] সরকার এই ধরনের প্রত্যক্ষ আলোচনার চিন্তা যে একেবারেই করেন নি, তা নয়। "পরিস্থিতির বিষয়ে বিডিআরের বিদ্রোহী জওয়ানদের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্স করবেন বলে" সংবাদমাধ্যমে জানা গিয়েছিল (তেহরান বাংলা রেডিও, ২০০৯)। এটা আমার বিচারে এই সরকারের বিশেষ শক্তির দিক। এই শক্তির ইতিহাস আওয়ামী লীগের ব্যাপক গণসম্পৃক্ততার ধারাবাহিক ইতিহাসে এবং সেই ধারার প্রতিনিধি-নেতা হিসেবে শেখ মুজিবর রহমানের উত্তরাধিকার বহনে শেখ হাসিনার (অন্তত আংশিক) সক্ষমতায়।

বিবৃতি, খালেদা জিয়ার যে-বিবৃতি, সেটাও যথেষ্ট বিবেচনাপূর্ণ বিবৃতিই মনে হয়েছে। সব ক্ষেত্র নিয়ে যেমন, আওয়ামী লীগ বিএনপি পরস্পরকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করে, অন্তত এই ঘটনা নিয়ে আমরা এখনও পর্যন্ত পরস্পরকে বেকায়দায় ফেলার মতো কোনো কথাবার্তা (দুই পক্ষেরই) শুনি নি। [০০:৪০:২০–০০:৪০:৪৫]

৪.৫ সংকট যত বড়, গণতন্ত্র তত বেশি দরকার

আমরা আশা করব, এই বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে, সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মহলগুলো উপযুক্ত সুবিবেচনা-সহকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন আগামী দিনগুলোতে। সেটা করা গেলে, এই বিডিআর-ই আরও অনেক নিয়মবদ্ধ, আরও অনেক সংহত, আরও অনেক উন্নত একটা বাহিনীতে পরিণত হতে পারবে। এই বিদ্রোহ সেই পথ খুলে দিয়েছে। যে-কথাগুলো জওয়ানরা বলতে পারে নি, গোটা সমাজ শুনতে পারে নি, অথচ হাজার হাজার লোক দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চনার শিকার হয়েছে, তা এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই তারা জানাতে পেরেছে, এবং গোটা সমাজ এখন তাদেরকে নিয়ে ভাবছে। [০০:৪২:৪০–০০:৪৩:১৫]

এখন, গোটা সমাজের মধ্যে, তার সমস্ত সেক্টরের মধ্যে, যত বেশি আলাপ-আলোচনা, যত বেশি পারস্পরিক লেনদেন, এগুলো করা যাবে, ততই মঙ্গল। মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেওয়া তো সুস্থ লক্ষণ না। একইভাবে, যদি টেলিভিশনও বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে গোটা দেশে উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা এবং সংকট আরো অনেক বেশি বেড়ে যাবে। এখনও টিভিতে যে টক-শো হচ্ছে, ক্যামেরা যে এখনও খোলা আছে, মোবাইল-নেটওয়ার্ক যে খোলা ছিল গতকাল পর্যন্ত, আজকেও দুপুরের আগ পর্যন্ত, এগুলো ভালো ছিল। [০০:৪৩:১৬–০০:৪৩:৪৭]

যত বেশি ডেমোক্রেসি থাকে, সংকট তত ভালোভাবে মোকাবেলা করা যায়। এটা ভুল তত্ত্ব যে, সংকট বড় হলে ডেমোক্রেসি বন্ধ করে দিতে হবে। বন্ধ করে দিলে সংকট মোকাবেলা করা যায় না। তখন অন্ধকার তৈরী হয়। অন্ধকার তৈরী হলে অন্ধকারের মধ্যে কে কী করছে কেউ বুঝতে পারে না। জনগণের মধ্যে তখন টিউনিং থাকে না। পারস্পরিক বোঝাপড়াগুলো থাকে না। তখন 'আমি তোমাকে সন্দেহ করব, তুমি আমাকে সন্দেহ করবা' অবস্থা। [০০:৪৩:৪৮–০০:৪৪:১৩]

তাহলে, গোটা সমাজের মধ্যে, তার সমস্ত সেক্টরে, তার সমস্ত প্রতিষ্ঠানে, যত বেশি গণতন্ত্র 'দেওয়া' যাবে, যত বেশি গণতান্ত্রিক বিধিবিধান চালু করা যাবে, যত বেশি সমস্ত মানুষকে সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করানো যাবে, তত বেশি এ সমাজে বিদ্রোহের ঝুঁকি কমে আসবে, তত বেশি এ সমাজ শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তত বেশি এ সমাজে বিশৃঙ্খলা হবে না, তত বেশি আমাদের এ সমাজে গণ্ডগোল, ক্যাওস, খুনখারাবি, এগুলা হবে না। [০০:৪৬:৫১–০০:৪৭:২৬]

যুক্তিনির্ভর সহিংসতা-সিস্টেম সুদীর্ঘকাল ধরে নিজেকে টিকিয়ে রেখেই ক্ষান্ত হয় না,
খুঁচিয়ে বের করে আনে সহিংসতার জবাবটাকেও।
... জবাবটা কখনো-কখনো সচেতন বিদ্রোহজনিত সহিংসতার রূপও ধারণ করে।

ফেরাল ফন, ১৯৯২

কথকতা পাঁচ

টেলিভিশনের যুগে বিদ্রোহ: ডিজুস-জমানায় প্রতিরোধ-চেতনা

আরেকটা দেখার মতো জিনিস: এই যে ডিজুসের যুগে, বিজ্ঞাপনের যুগে এত চাকচিক্য, এত 'সৌন্দর্য', এত 'স্বাস্থ্য', এতো 'গান' বাংলাদেশে ভরা—কর্পোরেট এলাকা থেকে—কর্পোরেট গান, কর্পোরেট নাটক, কর্পোরেট আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, কর্পোরেট সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, কর্পোরেট অভিনয়-প্রতিযোগিতা কত কিছু এখানে হচ্ছে (তাই না?), কত বিজ্ঞাপন, কত মডেল, কত মডেলিং, কত ফ্যাশান শো, কত কিছু, কত ডিজুস, কত আনন্দ—এই যুগে, অনেকেই বলতেন যে, আর বিদ্রোহ হবে না, মানুষ রুখে দাঁড়াবে না, মানুষ সংগঠিত হবে না। কিন্তু, এই যুগেই আমরা দেখতে পাচ্ছি—এত প্রলোভনের যুগে, এত মনোহারী পণ্যের ছলনার যুগে—একটা সুশৃঙ্খল সামরিক বাহিনীর ভেতরেই বিদ্রোহের চরম প্রকাশ। [০১:০৩:৪৩–০১:০৪:৩৪]

৫.১ বানানো বিনোদন দিয়ে বিদ্রোহের পথ আচ্ছন্ন করা যায়, রুদ্ধ করা যায় না

তার মানে ঐ সমস্ত ছলনা, প্রতারণা, তথাকথিত সংস্কৃতি, গ্ল্যামার—এইগুলো দিয়ে মানুষের চেতনাকে কিছুটা আচ্ছন্ন করা যায় বটে, কিন্তু বঞ্চনার মতো পরিস্থিতি যদি থাকে এবং তা সমাধানের স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পথ যদি খোলা না-থাকে, তাহলে বিদ্রোহ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এটাও আমরা দেখলাম। এই যুগে বিদ্রোহ। ঢাকা শহরে বিদ্রোহ। সামরিক একটা বাহিনীর ভেতরে বিদ্রোহ। গণবিদ্রোহ।[২৭] এটা এই

[২৭] **বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বিদ্রোহ**: কানসাটের বিদ্যুৎ-আন্দোলন, ফুলবাড়ির কয়লা-আন্দোলন, শনির আখড়ার বিদ্যুৎ-পানি-আন্দোলন, এবং মারাত্মক জরুরি আইনকে লঙ্ঘন করে সার-বীজ-তেলের দাবিতে সারাদেশের এখানে-সেখানে কৃষকদের ইউএনও-ঘেরাও ডিসি-ঘেরাও রাস্তা-অবরোধ প্রভৃতি আন্দোলন এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শিক্ষায়তনিক স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলন—এই সমস্ত আন্দোলনকে প্রশ্নাতীতভাবে 'বিদ্রোহ' নামে ডাকা যায়, কিন্তু আমাদের মিডিয়া ও শিক্ষিত-সমাজ তা করেন না, যদিও প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের চেতনা বাংলাদেশের মানুষের অন্তর্জাত ইতিহাস-চেতনায় সুপ্ত হয়ে আছে। [এর প্রকৃষ্ট নমুনা দেখতে পাই ভারতের 'ইন্দিরা পুরস্কার' গ্রহণের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'বিদ্রোহী আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না' আবৃত্তির ঘটনায় (http://www.prothom-alo.com/detail/date/2010-01-13/news/34 526)।] এগুলো সবই টিভির যুগে, ডিজুসের যুগে দলমতের ঊর্ধ্বে সাধারণ গণমানুষের বিদ্রোহের নমুনা। এগুলো সবই স্বতঃস্ফূর্ত, গণ চরিত্রের, যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা-কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জকারী, জনসাধারণের পরস্পরিক সংহতি-সহযোগিতা-ভালোবাসা-সৃজনশীলতার নানান চিহ্ন বহনকারী—এবং প্রচ্ছন্ন অর্থে—বিদ্যমান বৈষম্যমূলক ও কর্তৃত্বপরায়ন সমাজকাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন-প্রত্যাশী ও জন-মানুষের প্রত্যক্ষ তৎপরতাভিত্তিক মুক্তিচেতনায় জারিত।

অফিসারের নেতৃত্বে এক বাহিনী, ঐ অফিসারের নেতৃত্বে আরেক বাহিনী, পরস্পরের গোলাগুলি, কে বিডিআরের চিফ হবে তাই নিয়ে—তা কিন্তু না, কে বাংলাদেশ দখল করবে, কে বাংলাদেশ পরিচালনা করবে এই নিয়েও কিন্তু না; খুব আলাদা রকমের বিদ্রোহ—প্রকৃত গণবিদ্রোহ। [০১:০৪:৩৫–০১:০৫:২৫]

৫.২ বিদ্রোহের পক্ষে মিডিয়ার প্রাথমিক সমর্থন

[বিদ্রোহের সময়কার দিনগুলোতে প্রায় সব সংবাদপত্র এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ বরং প্রচ্ছন্ন এক ধরনের সেনাবিরোধী মনোভাব পোষণ করেছে। এই মত খুব প্রবল ছিল যে: সেনা-সদস্যদের তুলনায় সীমান্তে বিডিআর-সদস্যরাই জীবনের প্রকৃত ঝুঁকি নেয়, অথচ তার বিনিময়ে (সেনাবাহিনীর তুলনায়) ন্যূনতম প্রতিদানও পায় না। যন্ত্র-প্রযুক্তি, আর্থিক সুবিধা, প্রাতিষ্ঠানিক গৌরবের সম্মান, এমন কি সামরিক সুবিধাদি পর্যন্ত মূলত বলতে গেলে সেনাবাহিনীই পায় এবং এটা অন্যায়—এ রকম মনোভাব সারাদেশে সর্বত্র বিরাজমান ছিল।

এই 'ত্রুটিপূর্ণ' মতামত-মনোভাব মেরামত করার জন্যই মিডিয়ার কাভারেজ পরে হঠাৎ করে 'ইউ টার্ন' নেয়। মিডিয়ার পোষা এক্সপার্টরা মিডিয়ার কাভারেজের 'বাড়াবাড়ি' নিয়ে নিন্দামুখর হয়ে ওঠেন এবং বেশ কৌতুকোদ্দীপক কায়দায় বলতে গেলে প্রায় 'আত্মসমালোচনা' করে বসে মিডিয়া। বাজারে আসে সংশোধিত কাভারেজ। এই কাভারেজে 'বিদ্রোহী'রা আখ্যায়িত হয় 'খুনি', 'গণহত্যাকারী', 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনকারী', আর সেনা-অফিসারগণ হয়ে ওঠেন আমাদের 'মহান দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর চৌকষ কর্মকর্তা'। 'বিদ্রোহ' শব্দটা মিডিয়া থেকে স্রেফ হাওয়া হয়ে যায়। হাজির হয় 'পিলখানা হত্যাযজ্ঞ' জাতীয় শব্দমালা। শেষ পর্যায়ে অবশ্য 'বিদ্রোহ'কে ফিরিয়ে আনতে হয়, তবে সেটা 'বিদ্রোহ'কে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য নয়, 'বিদ্রোহ' এবং নানা প্রকার ফৌজদারি অপরাধে অপরাধী বিদ্রোহীদের 'বিচার' করার জন্য।]

৫.৩ লাশের কাভারেজ: রাজনীতি, মানবিকতা, সংবাদ-শালীনতা

এইখান থেকে আরো একটা দিক আমাদের রুলিং ক্লাসের শেখার আছে। এই যে সামরিক অফিসাররা যাঁরা ওখানে মারা গেলেন *নির্মমভাবে*, যাঁদের লাশের প্রতি ন্যূনতম

বিডিআর-বিদ্রোহের মতোই, এগুলোর একটাও 'রাজনৈতিক' কর্মকাণ্ড নয়, ক্ষমতাভিলাষীদের গণবিচ্ছিন্ন চক্রান্ত নয়, বরং আর্থ-সামাজিক রূপান্তরকামী গণবিদ্রোহ। স্থানীয়ভাবে দাঁড়ানো, আপাত-আলাদা, এ-জাতীয় আর্থ-সামাজিক আন্দোলনসমূহের দীর্ঘমেয়াদী, সুসংগঠিত, সারাদেশ-পর্যায়ের নেটওয়ার্ক/ফেডারেশন গড়ে ওঠাটা অসম্ভব কিছু নয়। যথাসম্ভব অহিংস উপায়ে এই জাতীয় 'গণ' আকারের সংগঠন-তৎপরতা-চিন্তা-আন্দোলন গড়ে তোলাটা কাঙ্ক্ষিতও বটে। সেক্ষেত্রে, এটাই হয়ে উঠতে পারে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাপা জামাত জেএমবি কমিউনিস্ট জনযুদ্ধ লাল পতাকা সুশীল সমাজের সৃষ্ট অনন্ত পাপ-চক্করের হাত থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ। এটাই হয়ে উঠতে পারে সহিংস রাজনীতি, জঙ্গি-সামরিকনীতি, সজ্ঞ-বাণিজ্যনীতি আর বাজার-দীক্ষায়ন-প্রচারণানীতির অতলে নিমজ্জমান বাংলাদেশের আত্ম-উদ্ধারের লক্ষ্যে পরিচালিত গণশক্তির র‍্যাডিক্যাল পাটাতন। আজকের কর্পোরেট টেলিভিশনের যুগে এরকম পথ-পাটাতন গড়ে তোলাটাই সত্যিকারের সচেতন মানুষের কাজ।

মানবিক মর্যাদাও প্রদর্শন করা হয় নাই, ড্রেনের ময়লা দিয়ে তাঁদের লাশ ভেসে আসছে, একটার পর একটা লাশ ভেসে আসছে[২৮]; এই যে তাঁরা যে-অবস্থার শিকার হলেন, এঁদের যে ছোট ছোট সন্তান, তাঁদের যে পরিবার, তাঁদের স্ত্রী, মা, বাবা — এই যে তাদের যে একটা স্বাভাবিক মানুষের জীবন, সেটা যে *ভয়ানকভাবে* টাল খেয়ে গেল, অজস্র মানুষের জীবন — ঐ বাচ্চাটা জীবনেও কিন্তু ট্রমা থেকে বের হতে পারবে না, আতঙ্ক থেকে বের হতে পারবে না, যে-বাচ্চাটা গতকাল থেকে ঐখানে বন্দী হয়ে আছে, না খেয়ে — বিশ্রী, অকল্পনীয় পরিস্থিতি, আমরা কল্পনাও করতে পারছি না। তো, এই যে রুলিং ক্লাসের একটা অংশ, যাঁদেরকে বাংলাদেশ তৈরী করেছে, সেনাবাহিনীর অফিসাররা, তাঁরা এই ধরনের প্রতিহিংসার শিকার হলো, এই ধরনের নির্মমতার শিকার হলো, এই ধরনের নিষ্ঠুরতার শিকার হলো, এখান থেকে আমাদের

---

[২৮] **মৃতদেহের মিডিয়া-কাভারেজ**: এইসব মৃতদেহের মিডিয়া-কাভারেজ ছিল খুব লক্ষ্যণীয় একটা ব্যাপার। শুরু থেকে মিডিয়া-কাভারেজ ছিল বিদ্রোহীদের বক্তব্য জানা এবং জানানোর প্রতি আগ্রহী। ফলে, মিডিয়া-বাহিত জনমত বিদ্রোহের প্রতি ব্যাপক সহানুভূতি তৈরী করে। এটা স্বভাবতই সেনা-সামরিক স্বার্থের বিরুদ্ধে গেছে। ফলে, মিডিয়ার কাভারেজের প্রকৃতি বদলানোর জন্য মিডিয়ার ওপর চাপ তৈরি হওয়ার সময় যখন উপস্থিত, ঠিক সেই সময়ই মিডিয়া নির্মমভাবে নিহত সামরিক অফিসারদের মৃতদেহসমূহের অকল্পনীয় অমানবিক দৃশ্যের অবাধ পরিবেশন ঘটিয়ে চলেছিল।

এই পরিবেশন-প্রদর্শনের রাজনৈতিক-অর্থনীতি বেশ আগ্রহ-উদ্দীপক। একদিকে, প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্রোহের এবং অনতি-প্রাথমিক অবস্থায় মৃতদেহের ‘লাইভ’ সম্প্রচার বাজার ধরার অর্থনৈতিক তাড়না থেকে উৎসারিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যদিকে, এক-এগারোর নিপীড়নমূলক প্রচ্ছন্ন-সামরিক জমানার পরিপ্রেক্ষিতে এক ধরনের সেনাক্ষমতা-বিরোধী সেন্টিমেন্ট থেকে ‘নিপীড়িত, অবহেলিত’ বিদ্রোহীদের প্রতি এক প্রকার একাত্মতা অনুভব করেছেন রিপোর্টারসমাজ, এটা আমার অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণজনিত অনুমান। পরে, অত জন সামরিক অফিসারের অমন বিভীষিকাপূর্ণ মৃত্যুর ঘটনায় সেনাবাহিনীর ‘প্রতিশোধপরায়ন’ হয়ে ওঠার আশঙ্কা এবং সেক্ষেত্রে জাতীয় রাষ্ট্রীয় দুর্যোগের কল্পনায় সুশীল সমাজ ভীত হয়ে ওঠে, এবং সেনাস্বার্থের প্রতি তাঁদের সমর্থনের প্রকাশ স্বরূপ সেনা-অফিসারদের অবমানিত মৃতদেহের সম্প্রচার অব্যাহত রাখে মিডিয়া। এই সম্প্রচার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত তৈরি করে। কিন্তু, মিডিয়া যে বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিমূলক কাভারেজ দিয়ে ভালো করে নি, সেই কথাটা সরাসরি বলতে না-পেরে আমাদের টকশো-বুদ্ধিজীবীরা বলতে থাকলেন, মিডিয়ার কাভারেজে ‘বাড়াবাড়ি’ ঘটেছে। কিসের বাড়াবাড়ি? তো, না, মিডিয়া যেভাবে লাশের ছবি দেখাচ্ছে সেটা অমানবিক, দৃষ্টিকটু, বাণিজ্যিক। ভেতরে-ভেতরে এই পারফরমার-বুদ্ধিজীবীরা ভেবেছিলেন, অফিসারদের লাশের এরকম অবমাননা সেনাবাহিনী ভালোভাবে নেবে না। কিন্তু, ঐ মৃতদেহ-মেলে-ধরা রিপোর্টিং সেনাস্বার্থের জন্য অতীব উপকারী ছিল। এবং এই উপকারী কাভারেজ শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। লাশ আবিষ্কার, লাশ উদ্ধার, লাশের সৎকার প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে মিডিয়া পাঠকের একান্ত মানবিক অনুভূতিগুলো নিয়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক খেলা খেলতে থাকে।

এইসব অনুভূতির চড়া সুরের ক্রমবর্ধমান প্রদর্শনী অচিরেই, বাজারের চাহিদা মেটাতে, পুরো কাভারেজটিকে কান্না-বেদনাপূর্ণ হিংসাবিরোধী সুর থেকে যুদ্ধংদেহী প্রতিশোধস্পৃহার দিকে বাঁক নেওয়ায়। ‘বিদ্রোহ’ হাওয়া হয়ে যায়, মিডিয়া-মঞ্চে হাজির হয় ‘বর্বর হত্যাযজ্ঞ’, ‘গণহত্যা’। শুধু মিডিয়ার সার্বিক কাভারেজ নিয়ে সুবিস্তৃত গবেষণা সম্পাদন করা অতীব জরুরী। ‘বিদ্রোহ’ ফিরে আসে ঢের পরে। ‘খুনী’, ‘বর্বর’, ‘লুটেরা’, ‘বিপথগামী’ জওয়ানদের ‘বিচার’-এর অধীনে আনার জন্য। রাষ্ট্র ও সামরিকতাকে এবং সীমান্তরক্ষী-বাহিনীকে তথা শৃঙ্খলা-বাহিনীসমূহকে ‘আইনের শাসন’ এর পথে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনে।

রুলিং ক্লাসের শেখার আছে। [০১:০৫:২৬–০১:০৬:২৬]

এই অফিসাররা প্রত্যেকে তো আর ব্যক্তিগতভাবে খারাপ লোক ছিলেন না, নিঃসন্দেহে। কিন্তু, পরিস্থিতির শিকার তাঁদেরকে হতে হলো! [০১:০৬:২৭–০১:০৬:৪৪]

৫.৪ সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: ডিজুস-জমানাতেও বিদ্রোহ সম্ভব

তাহলে পরে, সমস্ত ক্ষেত্রেই, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অতি দ্রুত—সত্যিকার অর্থে—সংস্কার করা, সত্যিকার অর্থে আরো গণতান্ত্রিক করে তোলা, সত্যিকার অর্থে বঞ্চনার জায়গাগুলো আরো কমিয়ে আনা, বৈষম্য কমিয়ে আনা, পারস্পরিক মর্যাদা স্বীকার করা, এগুলো—যত বেশি সম্ভব—এগুলো যদি আমরা করতে না পারি, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে রুলিং ক্লাস আছে, যে-অফিসারবৃন্দ আছেন, তারাও কখন কী পরিস্থিতির শিকার হবেন, এটা আমরা বলতে পারি না। খুব বড় ঘটনা আমাদের সামনে ঘটছে এবং সেই ঘটনা বলে দিচ্ছে যে: [রাষ্ট্রের আধুনিক শক্তিমত্তা ও কৃৎ-চাতুর্যের এই যুগেও] এত বড় ঘটনা ঘটা সম্ভব! এই ডিজুসের কালে![২৯] এটা একটা বিশাল ওয়ার্নিং। [গোটা রাষ্ট্রকে যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক করে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা এই মুহূর্ত থেকেই জরুরি। সমাজ ও ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতা ও সৃজনশীল বিকাশের বাস্তব শর্ত তৈরি করার দিকে আমাদের মন দেওয়া দরকার। লোভাতুর বাণিজ্যপরতা, পরশ্রীকাতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আত্মার আত্মকেন্দ্রিকতার আদর্শে সাজানো মনুষ্যগুণাবলীবর্জিত ফাঁপা সমাজ দিয়ে ঠেকানো যাবে না বিদ্রোহ, না বর্বরতা।] [০১:০৬:৪৫–০১:০৭:২৫]

৫.৫ মিডিয়ার স্বাধীনতা ও পাবলিক বিতর্ক: মিডিয়া-জওয়ান-জনসাধারণের স্বল্পস্থায়ী মৈত্রী

মিডিয়ার একটা রোল খেয়াল করলাম আমরা। মিডিয়া অনেক বেশি খোলামেলা একটা রোল প্লে করতে পারলো। তার আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে, টক-শোর ক্ষেত্রে এবং নিউজ-কাভারেজের ক্ষেত্রে। ক্যামেরাকে প্রায় অবাধে পরিচালিত হতে দেওয়া হলো। [০১:১২:১১–০১:১২:২৭]

এগুলো ইতিবাচক লক্ষণ—সমাজের জন্য। সংকটজনক মুহূর্তে এই টিভি-ক্যামেরা মানুষকে আশ্বাস দিয়েছে। কী ঘটছে, না ঘটছে, মানুষ জানে। যদি মানুষ অন্ধকারে পড়ে যেত! এখন এই মোবাইল-ফোন-নেটওয়ার্ক বন্ধ করা হয়েছে কোন যুক্তিতে, কার যুক্তিতে, ভগবান জানে। [০১:১২:২৮–০১:১২:৪৩]

এবং আমরা দেখলাম: মিডিয়ার সঙ্গে[৩০] বিডিআরের জওয়ানদের একটা

---

[২৯] সার্বক্ষণিক টেলিভিশন, হাতে হাতে মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, ওয়েবক্যাম, ডিজিটাল অডিও রেকর্ডারসহ হাজারো যোগাযোগপ্রযুক্তি বিদ্রোহ প্রচারে, বিদ্রোহ দমনে কী ভূমিকা পালন করেছে, সেটা আলাদা মনোযোগ দাবি করে। এই রচনায় সেদিকে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

[৩০] অর্থাৎ, টেলিভিশন-মিডিয়ার বিদ্রোহাঞ্চলে কর্মরত রিপোর্টারদের সাথে, এবং তাঁদের মাধ্যমে টেলিভিশনের নিউজরুমের সাথে। 'মিডিয়ার সঙ্গে' বলতে মিডিয়ার মালিক-পক্ষের সঙ্গে নয়। কোনোক্রমেই।

আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো। যে-জওয়ানরা এত ‘এলোপাতাড়ি’, এত ‘ক্ষিপ্ত’, এত ‘হিতাহিতজ্ঞানশূন্য’ হয়ে পড়েছে, সেই জওয়ানরাই কিন্তু মিডিয়াকে তাদের কাজে লাগাচ্ছে! মিডিয়াও খবর সংগ্রহ করার জন্য জওয়ানদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করল, এবং জওয়ান এবং মিডিয়ার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি হয়ে গেল! আমরা দেখলাম: অনেকবার, অনেক রিপোর্টার ভেতরে যাচ্ছেন, আসছেন, কাছে আসছেন, কথা বলছেন। নিরাপদে। [এই বোঝাপড়া বিদ্রোহী বিডিআর জওয়ানদের নিজেদের ভেতরকার বাহিনীগত ‘অটুট সমঝোতা’রও (১.১ অংশে কথিত) একটা প্রকাশ।] [০১: ১২:৪৪–০১:১৩:১৩]

একই সঙ্গে আমরা দেখলাম: অসংখ্য উৎসুক মানুষ। তাঁরা ওখানে জড়ো হয়েছেন: ‘কী হচ্ছে?’ মানুষ কিন্তু এই বলে ছেড়ে দেয় নি যে: ‘এটা আর্মির জিনিস, বিডিআরের জিনিস, ওরা বুঝুক; আমরা গেলে গুলি খাব, কী দরকার।’ এটা কিন্তু তারা করে নি। ব্যাপকসংখ্যক লোক ওখানে ভিড় করেছে। এবং এই ভিড়-করা লোকদের সঙ্গে বিডিআরের জওয়ানদের এক ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরী হয়েছে। মানুষ মনে করে নাই যে, বিডিআরের লোকেরা খুনি। এই রকম জায়গায় তারা পৌঁছায় নি। যদিও তারা জানে (সকাল থেকে) যে, ওখানে খুনখারাবি চলছে। আবার বিডিআরের জওয়ানরাও মানুষজনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে (মাইকিং করে, নানাভাবে) যে: আমরা নিপীড়িত, আমরা তোমাদের লোক, আমাদের সাহায্য কর, সমর্থন কর; আমাদেরকে আমাদের নায্য দাবি আদায়ে হেল্প কর। এইভাবে মিডিয়া, জওয়ান এবং সাধারণ মানুষদের একটা মৈত্রী—এটা কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম। তাই না? এটা সমাজের জন্য মঙ্গলজনক।[০১:১৩:১৪–০১:১৪:০৪]

জয় ও পরাজয়ের কিছুই স্থির নাই। অনেকে শত্রুকে পরাজয় করিতে গিয়া
স্বয়ং তাহার নিকটই পরাজিত হয়।... যিনি শত্রুর সর্বনাশ করিতে উদ্যত হয়েন,
তাঁহার আপনার সর্বনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

মহাভারত, ২০০১: ৫৯১

কথকতা ছয়

ব্যারাক, বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্রোহ

৬.১ বিদ্রোহের জমি সর্বত্র তৈরী আছে

আমলাতন্ত্রের মধ্যে, পুলিশের মধ্যে, সর্বক্ষেত্রে, অফিসারদের দিক থেকে—কিছু অফিসারদের দিক থেকে—ব্যাপক অনিয়ম, ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, ব্যাপক গণ্ডগোল, ক্যাওস—এগুলো তাঁরা কিন্তু তৈরি করে রেখেছেন। এগুলো খুব দ্রুত সমাধানের পথে যদি বাংলাদেশ না যায়, পরিণাম কী হবে কেউ বলতে পারে না। [০১:০৮:০৫–০১:০৮:২৩]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর আগে, সেই যে ৩০শে অক্টোবর [২০০৪] একটা বিদ্রোহ গেল। আমি এটাকে তখনই 'বিদ্রোহ' বলে আখ্যায়িত করেছিলাম [দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন ২০০৪]। এটা ছিল 'বাদশাহী' বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের বিদ্রোহ। সেটাও একটা গণবিদ্রোহ ছিল। সেটা সশস্ত্র বিদ্রোহ ছিল না বটে। কিন্তু, সেখানে রক্তপাত হয়েছে, ভাঙ্গচুর হয়েছে। এবং ওভার-অল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-মাত্রেরই বিরুদ্ধে, প্রক্টরদের বিরুদ্ধে, প্রশাসনওয়ালাদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ হয়েছে। কাজেই বোঝা যায় যে, ওভার-অল, টিচারদের বিরুদ্ধে, প্রক্টর, প্রশাসক—যত রকমের প্রশাসনিক পদে যাঁরা টিচাররা আছেন—তাঁদের সবার বিরুদ্ধেই কিন্তু ছাত্রদের একটা ব্যাপক, ঢালাও ক্ষোভ ছিল। [০০:৪৮:২১–০০:৪৯:০৭]

আমরা এর আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্রোহ হতে দেখেছি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যারাক—বিদ্রোহ সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত। ছাত্ররা যখন ভাঙচুর করে, গণহারে টিচারদের রুম ভাঙচুর করেছে। এইটার কোনো নিয়ম থাকে না। সামনে টিচার পেয়ে গেলে হয়ত মেরেও দিত। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা দেখেছি, একবার টিচারকে ছাত্ররা মারে কার্জন হলে এবং সাধারণভাবে ছাত্ররা এই মারার পক্ষেই ছিল।[৩১] বিডিআরের মতো অত বড় ঘটনা ঘটে নাই বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু সেটা তো যখন-তখন ঘটতে পারে। বিডিআরদের মতোই, ছাত্রদের ব্যাপক বঞ্চনা, ব্যাপক ক্ষোভ যুগ-যুগ ধরে আছে। কখন এই ক্ষোভ কীভাবে ফেটে বের হবে, এটা কেউ বলতে পারে না। [০১:০৭:২৬–০১:০৮:০৪]

যে সমস্ত কারণে বিডিআরের এতো বড় একটা বিদ্রোহ গড়ে ওঠার মতো জমি তৈরি হয়েছিল একই রকম কারণে একই রকমের জমি অন্যান্য সামরিক/অস্ত্রধারী

[৩১] এই ঘটনার সার্বিক বিশেষণ ও তার সাথে তৎকালীন ক্যাম্পাস পরিস্থিতির সম্পর্ক ও করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে দেখা যেতে পারে: সেলিম রেজা নিউটন, ১৯৯২।

বাহিনীগুলোতে এবং বেসামরিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও একই রকমের জমি, একই রকমের ছাঁচ, একই রকমের আলো-বাতাস-জল, একই রকমের ফ্যাক্টর, তৈরি আছে। [০০:৫৫:৫৩–০০:৫৬:১৭]

রাজনৈতিক দলের মধ্যেও একই অবস্থা। রাজনৈতিক দলের মধ্যে তো প্রায়ই দেখি আমরা যে: মন্ত্রীকে, নেতাকে দলীয় কর্মীরা পিটায়ে দিল, থাপ্পড় মেরে দিল, অপমান করে দিল। তাহলে, সর্বক্ষেত্রেই কিন্তু সমাজে এ ধরনের ব্যাপক বঞ্চনা, ক্ষোভ, ক্ষোভের জায়গা আছে। [০১:০৮:২৪–০১:০৮:৩৬]

গ্রামের মানুষ প্রতিদিন শহরে আসছে—জীবিকার জন্য, পেটের দায়ে। এসে দেখছে: শহরের মানুষজনরা কত ভালো আছে, কত বিদ্যুৎ, কত আলো, কত পণ্য, কত খাবারদাবার, কত ভালো, কত বিনোদনের জায়গা, আর আমাদের গ্রামে কিছু নাই। এই পরিস্থিতি দীর্ঘকাল ধরে চললে, কখন কী ঘটে যায় কিচ্ছু বলা যায় না—কবীর সুমনের গানের লাইন আছে না? সেই লাইনটার মতো— "হঠাৎ কী ঘটে যায়, কিচ্ছু বলা যায় না"।[৩২] [০১:০৮:৩৭–০১:০৯:০৪]

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন প্রচুর ধনসম্পদ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে—'নাই' 'নাই' করতে করতে। প্রচুর জমি আছে, প্রচুর বাড়ি আছে, কম্যান্ডে প্রচুর কর্মচারী আছে। অনেক কিছু আছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে কোটি কোটি টাকা আবর্তিত হয় গোটা বছর ধরে। এখানকার অনেক দোকানপাট, এখানকার মাছ, এখানকার পুকুর, এখানকার গাছ, অনেক কিছু—কৃষি, জমি—এগুলো নিয়ে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর অনিয়ম হয়। অফিসাররা এবং টিচাররা, 'প্রশাসক-শিক্ষক'রা—যাঁরা শুধু 'শিক্ষক' না, যাঁরা নিজেরাই নিজেদের নাম দিয়েছেন 'প্রশাসক', রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় তাঁরা নিজেদেরকে 'প্রশাসক' বলেন—তাঁদের এখানেও কিন্তু অনিয়ম। অনিয়মকে কেন্দ্র করে সুবিধা আদায়ের জন্য দল। টিচারদের দল মানেই তাই। ছাত্রদের দল মানেও তাই। ছাত্রদের দলের নেতারা অন্ততপক্ষে ঐ সুযোগসুবিধাগুলোর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্যই নেতা হতে চান। তার জন্যই অন্য দলকে পরাজিত করেন—বন্দুকযুদ্ধ করেন। নিজের দলকে পরাজিত করেন—বন্দুকযুদ্ধ করেন। যে নেতা হবে, সে এই সুযোগ-সুবিধা, টাকা-পয়সা, বিপুল অঙ্কের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। [০১:০৯:০৫–০১:১০:১৫]

একই জিনিস আমরা দেখলাম বিডিআরের মধ্যেও। জওয়ানরা অভিযোগ করল। বিডিআরের দোকান, বিডিআরের মাঠ, বিডিআরের দুধ, বিডিআরের ডাল, বিডিআরের সিনেমাহল, রাইফেল স্কয়ার, 'অপারেশন ডালভাত', তাদের নির্বাচনের বাড়তি ডিউটি করার টাকা—সবকিছু নিয়েই তাদের অভিযোগ যে: অফিসাররা এগুলো সব নিজেরা লুটপাট করেছেন। [০১:১০:১৬–০১:১০:৩৬]

বিশ্ববিদ্যালয়েও কিন্তু সেই জিনিস ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু কর্মচারীরা

---

[৩২] "কেউ যদি বেশি খাও, খাবার হিসেব নাও/কেননা অনেক লোক ভালো করে খায় না/খাওয়া না-খাওয়ার খেলা যদি চলে সারা বেলা/হঠাৎ কী ঘটে যায়, কিচ্ছু বলা যায় না" (সুমন চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯২)

সংগঠিত। কর্মচারীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ আছে—টিচারদের বিরুদ্ধে। কর্মচারীরা ৫০ বছর আগে প্রফেসরদেরকে দেখলে যে রকম ভক্তি করতো—আন্তরিকভাবে, এখন সেই ভক্তি করে না। এখন তারা বোঝে যে: বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অফিসার, বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রফেসর—অফিসার এবং প্রফেসর—তারা কে ক্ষমতায় আছে। যে ক্ষমতায় আছে, তাকে তারা একভাবে সালাম দেয়; আর, যে ক্ষমতায় নাই, তাকে তারা অন্যভাবে সালাম দেয়। মানে তাকে তারা নানাভাবে উপেক্ষা করে। ভেতর থেকে তাদের কোনো ভক্তি আসে না, শ্রদ্ধা আসে না। এগুলো টিচাররা হারিয়েছেন। প্রফেসর-প্রশাসকেরা এগুলো হারিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সংগঠন [প্রতিষ্ঠানগত/সংগঠনগত বিন্যাস], যে-প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুন, পরিচালনার বিধি—এগুলোর ব্যাপক অপপ্রয়োগ ঘটানোর মধ্য দিয়ে; কর্তৃত্বপরায়ন ক্ষমতা-নীতি পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে। এখানেও তাহলে একটা বিস্ফোরক-পরিস্থিতি আছে। যখন-তখন ঘটবে। [০১:১০:৩৭–০১:১১:৩১]

সব প্রতিষ্ঠানেই তাই। তাই, আমরা দেখলাম যে, বিডিআরের মতো সামরিক বাহিনীর[৩৩] প্রতিষ্ঠানও ওরকম হয়ে পড়েছে। পুলিশে যে এরকম হচ্ছে, সেটা আমরা জানি। এদের চাকরিতে নিয়োগ, প্রমোশন কোনোকিছুরই ঠিক নাই। পুলিশের নিজের জওয়ানরা নিজের অফিসারকে টাকা ঘুষ দিতে পারলে তাদের বদলি হয়—ভালো জায়গায়। না-হলে, খারাপ জায়গায় পোস্টিং হয়। অকল্পনীয় পরিস্থিতি পুলিশের মধ্যে। আমরা দেখলাম বিডিআরদের ভেতরের পরিস্থিতি কোনো অংশেই ভালো ছিল

---

[৩৩] **সামরিকবাহিনীসমূহের তালিকা**: বিডিআরকে বারবার 'সামরিক বাহিনী' বলে উলেখ করছি কেন, সেটা বলা দরকার। খুঁটিনাটি সামরিক কায়দা-কারিগরির দিক থেকে দেখলে, বিডিআরকে 'আধাসামরিক' নামে ডাকাটা ব্যাকরণসম্মত হয় ঠিকই, কিন্তু, সমাজের নিরস্ত্র বেসামরিক এলাকার সাথে তুলনা করে দেখলে, সাধারণ গণমানুষের 'সামাজিক' চোখ দিয়ে দেখলে, বিডিআর-র‌্যাব-পুলিশ-সোয়াট-মিলিটারি-নৌ-বিমান প্রভৃতি বাহিনীর সবগুলোই সশস্ত্র, সামরিক বাহিনীই বটে। 'বাংলাদেশ মিলিটারি ফোর্সেস' এর সরকারী ওয়েবসাইটের (http://www.bdmilitary. com/) 'ফোর্সেস ওভারভিউ' (বাহিনীসমূহের পরিচিতি) অংশে ১৭টি বাহিনীকে 'বাংলাদেশ মিলিটারি ফোর্সেস' (বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীসমূহ) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলো হলো: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইনটেলিজেন্স বা ডিজিএফআই, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স বা এনএসআই, বাংলাদেশ রাইফেলস বা বিডিআর, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ স্পেশাল উইপনস অ্যান্ড ট্যাকটিক্স্ বা ডিএমপি সোয়াট, র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন বা র‌্যাব, আনসার বাহিনী/ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি বা ভিডিপি, ন্যাশনাল পুলিশ ব্যুরো অফ কাউন্টার টেররিজম বা এনপিবি কাউন্টার টেররিজম, ব্যুরো অফ ক্রাইসিস রেসপন্স অ্যান্ড প্রোটেকশন বা বিসিআরপি, প্যারাকম্যান্ডোজ, প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স, এবং বাংলাদেশ নেভি স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ (সোয়াড্স্)। [এই তথ্য ২৫শে নভেম্বর ২০০৯ তারিখে ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত হয়েছে।] রচনা-শেষে প্রদত্ত সারণীতে বাহিনীগুলোকে এক নজরে দেখা যাবে (দ্রষ্টব্য: সারণী ০১)। এতে উলে-খিত 'সিভিল ডিফেন্স' বা দমকল বাহিনীকে যোগ করলে মোট বাহিনী হয় ১৮টা।

abank
BRAC BANK

না। আরো অনেক খারাপ ছিল পরিস্থিতি।[৩৪] তার মানে: গোটা সমাজের সমস্ত কর্তৃত্বপরায়ন প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমাদের রি-থিংক করার দরকার আছে। [এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক নবায়ন দরকার। মানুষের ও সমাজের স্বাধীনতার সীমা বাড়ানো দরকার।] [০১:১১:৩২–০১:১২:১০]

আমাদের সবগুলো সরকারী প্রতিষ্ঠানে, সামরিক এবং বেসরকারী-সরকারী প্রতিষ্ঠানে, আমি বলেছি, একই রকমের জমি প্রস্তুত আছে। সর্বক্ষেত্রেই নিচের স্তরের—এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ—মেম্বার বঞ্চিত। তাদের বঞ্চনা শোনার কেউ নাই। নালিশ করার তাদের কেউ নাই। এই সমস্ত বঞ্চনা যদি চলতে থাকে, তাহলে কেউ বলতে পারে না কখন এই ধরনের ব্যাপক বিদ্রোহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, যেটা গোটা সমাজের জন্য অনেক ক্ষয়-ক্ষতি ডেকে আনবে। [০১:০০:৪৭–০০:১:০১:১৭]

যদি-বা আলটিমেটলি বিদ্রোহগুলো হয়ও, তাহলে সেটা সমাজের জন্য ইতিবাচক অর্থে কতকগুলো সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু সেই সুযোগ সমাজ-নেতারা নেবেন কিনা তার তো ঠিক নাই; ফলে তার মধ্যে দিয়ে পরিস্থিতি আরো অনেক খারাপ দিকেও যেতে পারে। [০১:০১:১৮–০১:০১:৩০]

৬.২ দরবারের মানসিকতা। ক্যাম্পাসে এবং ক্যান্টনমেন্টে।

বিডিআর-এর 'দরবার হল', দরবারের মানসিকতা, নিয়ে [*নিউ এজ* সম্পাদক] নুরুল কবির দেখলাম বলছেন। হ্যাঁ, বাদশাহ্‌র মানসিকতা। এগুলো আছে। এগুলো আমাদের এখানেও আছে! টিচার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে ঢোকে, ছাত্ররা উঠে দাঁড়ায়, সোজা হয়ে। এর মতো কুৎসিত দৃশ্য হয় না, এর মতো অশ্লীল দৃশ্য হয় না যে: আমি হচ্ছি এখানে পণ্ডিত, তোমরা আমাকে উঠে দাঁড়ানোর মাধ্যমে সম্মান করবা। সম্মান দেখানোর জন্য[৩৫] এই ধরনের সামরিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন পড়ে না। যে উঠে

---

[৩৪] সেনা-অফিসাররা পিলখানায় কতটুকু দুর্নীতি আদৌ করেছেন জানি না। বর্তমান বাজারে বেতনভাতায় শিক্ষকেরা তো গরিবই: হয় আপনাকে 'ধান্দা' করে টাকা কামাই করতে হবে, নয় তো নিদারুণ অর্থাভাবে মাস চালাতে হবে। নিরপেক্ষ তদন্ত হলে জানা যাবে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকেরা, তাঁদের অনেকে, ছোটবড় নানারকম দুর্নীতি করছেন, কর্তৃত্বপরায়ন ক্ষমতানীতি পরিচালনার মধ্য দিয়ে। ।

[৩৫] **বাদশাহী আদবকায়দা প্রসঙ্গে**: বিদ্যমান বাদশাহী সমাজে সম্মান একটা 'দেখানো'র জিনিস। 'সম্মান' শব্দটার সাথে 'প্রদর্শন' শব্দটা কর্তৃত্বের অটুট বন্ধনে বাঁধা। সম্মান 'দেখানো'র জিনিস হয় কেন? কেননা এর সাথে সম্পর্কের উচ্চনিচ-ক্রমতান্ত্রিক আয়োজন, ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা এবং কর্তৃত্ব-আনুগত্যের কাঠামো জড়িত। খোদ আদবকায়দা (এবং বেয়াদবির) প্রশ্নটাই রাজদরবারের প্রশ্ন। সম্মান প্রদর্শন আর আনুগত্য প্রদর্শন একই কথা। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার চশমা খুলে রেখে স্বাভাবিক মনুষ্য-চোখে দেখলে বোঝা যায়: সকল মানুষের বাচ্চারই মান-সম্মান আছে, মানে স্ব-অধীনতা আছে, আত্মকর্তৃত্ব আছে। এটা দেখানোর জিনিস না। তলপেটে আত্মা যদি থাকেও, সেটা খুলে দেখানোর দরকার পড়ে না। কর্তৃত্ব-আনুগত্যের 'সর্বজনীন' কাঠামোটাকে বিবেচনায় নিলে, বিডিআর এবং বিশ্ববিদ্যালয় মূলগতভাবে একই ধরনের কর্তৃত্বপরায়ন প্রতিষ্ঠান। উভয় প্রতিষ্ঠানের স্বঘোষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিচার করলে এমন কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না। অর্থাৎ, বোঝা যায়: (স্বঘোষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তথা) বুলি এবং বাস্তবতা এক নয়। বুলি মানে ঠুলি, বাস্তবতা মানে খোলা দৃষ্টি।

দাঁড়াবে না, সে বেয়াদব। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আদবকায়দা এবং বেয়াদবির জায়গা নাই। এখানে পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শনের—ঐ স্যালুট মারার জায়গা নাই। এখানে জায়গাটা হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের। জ্ঞান অর্জনের জন্য তুমি-আমি যত বেশি এক সাথে হতে পারব, যত বেশি সহজভাবে আলাপ করতে পারব—*যত ফ্রি-লি*—তত বেশি আমিও শিখব (প্রফেসর), তত বেশি তুমিও শিখবা (স্টুডেন্ট), তাই না? [০১:১৫:০১–০১:১৫:৫৩]

শেখার নিয়ম হচ্ছে: মনের মধ্যে প্রশ্ন আসতে হবে, কৌতূহল আসতে হবে, উৎসুক হতে হবে, ভাবতে হবে। তার জন্য তো স্বাধীনতা লাগবে! অথচ তুমি আগেই ধরে নাও যে: এই হলো কোর্স, এই হচ্ছে প্রশ্ন, এই অব্দি উত্তর লিখতে হবে, এই নোট আছে, স্যারকে সালাম দিতে হবে, স্যার 'আকাম' করবে, ঠিকমতো প্রশ্ন জমা দিবে না, ঠিক মতো খাতা জমা দিবে না, ঠিক মতো খাতা দেখবে না, নাম্বার কমবেশি করবে, এগুলো আমরা জানি, সবাই সেকেন্ড ক্লাস পাব, এটাও আমরা জানি। গোটাটার মধ্যে কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার কোনো পরিবেশই নাই। ছাত্রদের মধ্যে কোনো আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। সব মারা যায়। আকাঙ্ক্ষা মরে যায়। ফার্স্ট ইয়ারে তারা তাজা মন নিয়ে ঢোকে, আর মরা মন নিয়ে এখান থেকে বের হয়। একটা হতাশ মন নিয়ে গোটা বাংলাদেশের যুবসমাজ এখান থেকে বের হয়। (তাজা মন নিয়ে তারা ঢোকে যে: বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার চান্স পেয়েছি, এখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখব, আমরা বাংলাদেশকে ভালো করে চালাব ভবিষ্যতে, আমরা দেশকে সার্ভ করার জন্য সুযোগ পাব।) খুব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কিন্তু। [০১:১৫:৫৪–০১:১৬:৪০]

বিডিআরের ওখানেও তাই। অফিসার আসবে, স্যালুট দিবা। আর তুমি জানো: অফিসারের প্রতি তোমার 'ঘৃণা' আছে, আর তোমার প্রতি অফিসারের 'ঘৃণা' আছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচাররা মনে করি যেন আমরা জমিদার। আমরা প্রক্টর। আমরা ভিসি। আমরা টিচার। ছাত্ররা ডাল-ভাত খেতে পায় না। ডালের মধ্যে শেয়ালের মাংশ ঢোকে।[৩৬] কোনখান থেকে কী হয়, না হয়, ঠিক নাই কোনো কিছুর। আর আমরা এখানে পশ্চিম পাড়াতে ভালো থাকব, সুখে থাকব, ভালো বাড়িতে থাকব। (এখানেও অনেক ঝামেলা আছে। এখানে টিচারদের মধ্যে যারা মাতব্বর, তাদের বাড়ি ভালো, তাদের বেসিন ভালো, তাদের সিঙ্ক ভালো, তাদের টয়লেটে টাইলস লাগানো; আর বাকি সব বাড়ি ধ্যাদ্ধ্যারা, পানি পড়ে, মেঝে দেবে গেছে, মাটি থেকে স্যাঁৎসেঁতে জল ওঠে, ট্যাঙ্কির অবস্থা ভালো না, টয়লেট দুইটা পরিত্যক্ত, মশার ড্রেনে থাকতে হয়।) [০১:১৬:৪১– ০১:১৭:২৭]

তো, এরকম দরবারি মানসিকতা, বাদশাহী মানসিকতা আছে। আমি তো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে 'বাদশাহী বিশ্ববিদ্যালয়' (সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৪) বলি—এবং শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে না—পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মানেই হচ্ছে

---

[৩৬] রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদারবক্স হলের ছাত্রদেরকে ২০০০ সালের নভেম্বর মাসের কোনো এক সাধারণ দিনে শেয়ালের মাংস রান্না করে খেতে দেওয়া হয়েছিল হল-ডাইনিঙে। বিষয়টা ধরা পড়ে যায়। এবং ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে ক্যাম্পাসে।

'বাদশাহী বিশ্ববিদ্যালয়', যেখানে ভিসি হচ্ছেন একজন প্রধান বাদশাহ, মোঘল-সম্রাট, এবং তার এক 'দরবার' আছে।[৩৭] তিনি যখন সকাল বেলা 'মর্নিং ওয়াক' করেন, তখন দরবার তার সঙ্গে হাঁটে। তিনি যখন ঘুমান, দরবার পাহারা দেয়। তিনি যখন ভিসি থাকেন না—পরের দিনই তিনি একা। দরবার নাই। দরবার আরেকজনের কাছে ট্রান্সফার হয়েছে। তখন ভিসি একা-একা মর্নিং ওয়াক করতে থাকেন। আমি পশ্চিমপাড়ায় দেখেছি। [০১:১৭:২৮–০১:১৮:০৬]

এই যে বিচ্ছিন্নতা, সমগ্রর কাছ থেকে কর্তাদের বিচ্ছিন্নতা—এটা সেনাবাহিনীতেও, এটা সব সামরিক বাহিনীতে, এটা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এটা স্কুলগুলোতে, এটা আমলাতন্ত্রের মধ্যে, এটা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। আমাদের সমাজ *খুব* বিপজ্জনক জায়গায় পড়ে গিয়েছে। বিডিআরের বিদ্রোহ আমাদেরকে এটা বুঝতে সাহায্য করল। তাদেরকে আমাদের এক কারণে ধন্যবাদ দিতে হয় যে, গোটা সমাজ এবার নিজেকে নিয়ে ভাবার একটা সুযোগ পেয়েছে। যত বেশি এই সুযোগ খোলামেলাভাবে ব্যবহার করা যাবে, করতে দেওয়া হবে, ততই ভালো হবে। [০১:১৮:০৭–০১:১৮:৩৯]

---

[৩৭] **রাজার ধারণা**: 'রাজা', 'বাদশাহ', 'সম্রাট', 'নবাব' নাম এখনও আমাদের আত্মীয়স্বজনদের পরিচয় বহন করে। উপরন্তু, বনের রাজা, পশুর রাজা, মাছের রাজা, রাজপুত্রের মতো চেহারা, রাজকন্যার মতো সুন্দরী ইত্যাদি-প্রভৃতি ধারণারাশি গ্রামীণ লোকমানসে এই রাজদরবারি-মানসিকতার প্রবল উপস্থিতির স্মারক। অন্য দিকে, শিক্ষিত শহুরে ভদ্রসমাজের ক্ষেত্রেও তাই। রাজশাহী মহানগরীর অন্যতম বড় চাইনিজ রেস্টুরেন্টের বৃহত্তম স্পেসটার নাম হয় 'নানকিং দরবার হল'। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক দৃষ্টান্ত: ভারতের মতো মহাগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তরের একটি পুরস্কার 'ইন্দিরা পুরস্কার' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেওয়া হলো দিল্লীস্থ রাষ্ট্রপতি-ভবনের 'দরবার হলে' (http://www.prothom-alo.com/detail/date/2010-01-13/news/34526)। এমনকি প্রতিবাদী ধারার লোকধর্মের ভেতরেও আজমিরে 'খাজা বাবার দরবার', রাজশাহীর ভদ্রা-জামালপুরে 'ওলি বাবার দরবার', 'চন্দ্রপাড়া পাক দরবার শরিফ' (http://www.facebook.com/profile.php?id=100000647735538) সর্বত্র দরবার। সমাধিগুলো দেখতেও রাজপ্রাসাদের দুর্বল অনুকরণ। রাজার ধারণা এখনো আমাদের সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রাজতন্ত্রের খোঁয়ারিতে আছি আমরা।

আগ্রাসন এবং সহিংসতার ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ নয়,
আমাদের দরকার ধ্বংসস্পৃহা এবং সহিংসতা কমানো। এবং সেটা সম্ভব হতে পারে
ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনকে আরও অর্থময়, আরও মানবিক করে তোলার মাধ্যমে।

এরিক ফ্রম, ১৯৬৯

কথকতা সাত

সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ: সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন

একটা জিনিস খুব পরিষ্কার যে, এ রকম ১২/১৫ কোটি লোকের একটা দেশ, অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশ, যেখানে গোলাগুলি করা শেখার জন্য একটা আলাদা মাটি খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়, বসতিহীন মাটি খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়, সেরকম একটা দেশে. জনগণের কাছ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রধারী অনেকগুলো রাষ্ট্রীয় বাহিনী বানিয়ে রাখা সমাজের জন্য কতখানি নিরাপদ? [০০:৫৩:৪১–০০:৫৪:১৫]

৭.১ বঞ্চনা, মর্যাদাহীনতা এবং নিয়ন্ত্রণ অন্যসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানেও

এখন যদি এতগুলো সেনা-অফিসারের লাশ দেখে, সেই লাশ নালায় ভেসে আসছে দেখে সেনাবাহিনীর মধ্যেও একই রকমের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়? তাহলে গোটা সমাজের অবস্থা কী হবে? তার নিরাপত্তা, তার শান্তি কোথায় যাবে? যদি বাহিনীগুলোর মধ্যে চেইন অফ কমান্ড ভেঙ্গে পড়ে? আমরা কল্পনাও করতে পারি না। গা শিউরে ওঠে। একটা বাহিনীর তো চেইন অফ কমান্ড ভেঙ্গে পড়েছে! একই রকমের বঞ্চনা, একই রকমের বৈষম্য, একই রকমের মর্যাদাহীনতার মতো পাটাতন অন্যান্য বাহিনীতেও আছে। এবং শুধু বাহিনীগুলোতে না, রাষ্ট্রের সিভিলিয়ান অংশের মধ্যেও আছে।[০০:৫৪:১৬–০০:৫৫:০৭]

সচিবের বিরুদ্ধে ওখানকার নিম্নস্তরের কর্মকর্তাদের প্রচুর ক্ষোভ আছে—সচিবালয়ে। সচিবালয়ের কর্মচারীদের আলাদা ইউনিটি আছে, আলাদা সমিতি আছে। তো, সেই সমিতিকে সচিবদের পক্ষে ম্যানেজ করাটা আসলে কঠিন হয়। আমরা দেখেছি, গোটা সোনালী ব্যাংক বলতে গেলে পরিচালনা করে সোনালী ব্যাংকের কর্মচারী সমিতি—তার নেতারা। প্রত্যেক কর্মচারীর লাভ ওখানে হয় না। কিন্তু, কর্মচারীদের নামে পরিচালিত সমিতির নাম ভাঙ্গিয়ে কিছু নেতা—তাঁরাই তো পরিচালনা করেন! তাঁরাই মূল ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছেন। তার মানে, সিভিলিয়ান যে-সমস্ত কর্তৃত্বপরায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো, সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরেও কিন্তু প্রায় একই রকম মর্যাদাহীনতা, মর্যাদা-সংকট, মর্যাদা-বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য—এগুলো ষোল আনা আছে।[০০:৫৫:০৮–০০:৫৫:৫২]

৭.২ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিডিআর-বিদ্রোহের মতো জমি তৈরী রাখা নিরাপদ না

এই রকম একটা পাটাতন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর (রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগকারী, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর) প্রস্তুত রাখা সমাজের জন্য নিরাপদ না। আমরা দেখেছি,

আমাদের সেনাবাহিনীতে ৭২ সালের পর থেকে অসংখ্যবার বিদ্রোহ হয়েছে। আমরা এই রকম এককাট্টা গণবিদ্রোহ হয়ত তেমন দেখি নি, কিন্তু নানান রকম বিদ্রোহ দেখেছি। শুধু 'জওয়ান বনাম অফিসার' এমন বিদ্রোহও আমরা দেখেছি, কর্নেল তাহেরের সময়। এবং এগুলোতে অসংখ্য প্রাণক্ষয় হয়েছে, রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়েছে, সেনাবাহিনীর ক্ষতি হয়েছে, সমাজের ক্ষতি হয়েছে, আমাদের গোটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, কেউ বাদ যায় নি (গুটিকয় রাজনৈতিক নেতা, গুটিকয় সামরিক অফিসার ছাড়া)। একই রকম বিদ্রোহ আমরা আনসারদের মধ্যে দেখেছি। এত সশস্ত্র না, এত বিধ্বংসী না, কিন্তু খুব গণবিদ্রোহ আমরা আনসারবাহিনীতে দেখেছি।[৩৮] আমরা কারাগারগুলোতে বারবার বিদ্রোহ হতে দেখেছি[৩৯]। এই বিদ্রোহগুলো নিয়ে সমাজ এত যত্ন নিয়ে, এত আদর করে, এত দরদ দিয়ে ভাবে নি। এই সমস্ত বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে, সামরিকভাবে দমন করা হয়েছে। [০০:৫৬:১৮–০০:৫৭:৩৪]

৭.৩ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সত্যিকারের পাবলিক-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা দরকার

মিলিটারি ইন্টেজিলেন্সকে, এবং খোদ মিলিটারিকে, পাবলিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে পাবলিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। [০১:২৩:৩১–০১:২৩ :৪২]

দেখতে মনে হয়: বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু, তা না। বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ-বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান। এখানে যা লেখাপড়া করানো হয়, এইখানকার বইয়ের ভাষা রিকশাওয়ালা পড়ে বুঝবে না। এমন কি অন্য[৪০] শিক্ষিত লোক পড়ে বুঝবে না। এখানে আমরা কী করি না করি, গোটা সমাজ বুঝে না। গোটা সমাজের এটা কী কাজে লাগে, তাও বুঝে না গোটা সমাজ। আমরা এখানে শিখতে শিখতে কতটুকু শিখে বের হই—আমরা জানি না। তাই না? ফলে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক, প্রকৃত অর্থে জনগণের জন্য, জনগণকে সার্ভ করবার জন্য যে-প্রতিষ্ঠান সেভাবে গড়ে ওঠে নি। 'জনগণকে' মানে কী? 'আমাকে', 'নিজেকে', 'আমার সমাজ'কে, 'আমার অস্তিত্ব'কে। এসব ক্ষেত্রে আমি যদি সার্ভ করতে না পারি, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিয়ে কী হবে? ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়কে আমাদের দেশে 'পাবলিক' করতে হবে। আর্মিকে আমাদের দেশে 'পাবলিক' করতে হবে। [০১:২৩:৪৩–০১:২৪:২১]

বন্দুক এবং জনগণ: আলাদা-আলাদা চলছে। চলছে তো চলছেই। বন্দুক এবং জনগণ কাছাকাছি থাকতে হবে। তাহলে, বন্দুকের দিক থেকে সম্ভাব্য বিপদ কমে যাবে। বন্দুক এবং জনগণ যদি বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহলে বন্দুকের দিক থেকে আচমকা

---

[৩৮] আনসার-বিদ্রোহ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: আলতাফ পারভেজ, ১৯৯৫-ক; ফরহাদ মজহার, ১৯৯৫; আলতাফ পারভেজ, ১৯৯৫-খ।

[৩৯] বাংলাদেশের কারাবিদ্রোহের জন্য দ্রষ্টব্য: আলতাফ পারভেজ, ২০০০।

[৪০] 'অন্য শিক্ষিত' বলতে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষিত মানুষজনকে বোঝানো হচ্ছে, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন নি, করেন না।

বিপদের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। [০১:২৪:২২–০১:২৪:৪০]

একটা মূল জায়গা আমরা এখানে লক্ষ করতে পারি, (একটু আগে একভাবে বলেই ফেলেছি প্রায়), সেটা হলো: সামরিক প্রশ্নটা তাহলে আর বিচ্ছিন্ন সামরিক প্রশ্ন থাকতে পারে না। এই বিদ্রোহ আমাদেরকে দেখালো যে: গোটা দেশের-রাষ্ট্রের সামগ্রিক সামরিক প্রশ্নগুলো এগুলো বিপুল পরিমাণে বেসামরিক নিয়ন্ত্রণে, বেসামরিক পরিচালনাধীনে, জনগণের নজরদারির আওতায়, সুস্পষ্টভাবে, স্বচ্ছভাবে, পরিচালনা করতে পারলে সমাজের জন্য এবং সামরিক বাহিনীর জন্য বিপদ কমে আসে; আমাদের নিরাপত্তা বাড়ে। [২য় অডিও-ফাইল ০০:০০:০০–০:০১:১৭]

৭.৪ নিরাপত্তা শুধু 'সামরিক' নয়—আর্থসামাজিক ও জনলগ্ন একটা ব্যাপার

বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রামবাসীরা যথেষ্ট না? যদি ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করতে চায়—কে ঠেকাবে?[৪১] বিডিআর ঠেকাবে? পারবে? তার বাহিনী, তার ক্ষমতা, তার আর্মস, আর বিএসএফের ক্ষমতা-আর্মস যদি তুলনা করি? জনগণকেই ঠেকাতে হবে। হ্যাঁ, আমার সীমান্তরক্ষী-বাহিনী থাক, বিডিআর থাক। সে-বাহিনী গঠিত হবে স্পেশাল ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকজন নিয়ে—জনগণের ভেতর থেকে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষকে সামরিক ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব। যেন যেকোনো বিপদে গোটা কমিউনিটি, গোটা পিপল, সামরিক বাহিনীর মতো করে কাজে নামতে পারে। এটা সম্ভব। আর, নিরাপত্তার জন্য দরকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা। দরকার মানুষের পারস্পরিক চরম ঐক্য। যে-দেশের সবাই ঐক্যবদ্ধ সে দেশকে দমানো যায় না আর্মি দিয়ে। অন্য দেশ তাকে দখল করতে পারে না। অন্য দেশ সহজে তাকে আক্রমণও করে না। তাই না? আর, যেখানে সামরিক বাহিনী আর জনগণ বিচ্ছিন্ন, ঐখানেই সামরিক বাহিনীকে আক্রমণ করে পরাজিত করা সম্ভব হয়। [০১:২৪:৪১–০১:২৫:৫৯]

৭.৫ দেশ, রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব ও সেনাবাহিনী

['অন্য দেশ' না-বলে 'অন্য রাষ্ট্র' বললে সঙ্গত হতো; অধিকতর সঙ্গত হতো 'অন্য রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী' বললে। দেশ এবং রাষ্ট্র এক নয়। দেশ একটা প্রাকৃতিক-সামাজিক ধারণা। আর, রাষ্ট্র একটা রাজনৈতিক-সামরিক ধারণা। দেশ মানে জনগণ। দেশের কোনো সার্বভৌমত্বের প্রয়োজন পড়ে না। সার্বভৌমত্ব মানে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব। এই জন্য, ধারণাগত দিক থেকে, দেশ মানে শত্রু-দেশ নয়, কিন্তু রাষ্ট্র মানেই শত্রু-রাষ্ট্র,

---

[৪১] এবারের বিডিআর-বিদ্রোহের পরে অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রীয় সীমান্ত সম্পূর্ণভাবেই, বলতে গেলে, অরক্ষিত ছিল। কিন্তু, ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম তো করেই নি, আমাদের বিডিআর-প্রধান মেজর জেনারেল মইনুল ইসলাম সীমান্ত-বৈঠকে (১২–১৪ জুলাই ২০০৯) ভারতীয় সীমান্তরক্ষী-বাহিনী বা বিএসএফ-এর প্রধানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এসেছেন, বিডিআরের বিপদের সময় বিএসএফ-এর সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের কারণে। অতএব, বলতে গেলে দুর্দান্তভাবে প্রমাণিতই হলো যে, প্রকৃতপক্ষে সীমান্ত-নিরাপত্তা তথা সার্বভৌমত্ব যত না সামরিক ব্যাপার, তার চেয়ে বেশি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সহযোগিতা এবং সমঝোতার ব্যাপার।

পরস্পরের দিকে তাক করে রাখা বন্দুক-কামান-ট্যাঙ্ক-বিমান-নৌবহর। রাষ্ট্র সার্বভৌম অন্য রাষ্ট্রের তুলনায়। রাষ্ট্র সার্বভৌম তার নিজ দেশের জনগণের উপরও। সার্বভৌমত্ব এখানে সামরিক ঘটনাই বটে। সে কারণেই জনগণ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতীক নয়, রাষ্ট্রীয় 'সার্বভৌমত্বের উজ্জ্বল প্রতীক' হচ্ছে সেনাবাহিনী। সুতরাং, বিডিআর-বিদ্রোহের বিচারের জন্য রাঙামাটিতে প্রথম আদালত বসার আগের দিন, ২৩শে নভেম্বর ২০০৯, ঢাকা সেনানিবাসে সেনা সদর দপ্তরে সেনাবাহিনীর ফর্মেশন কমান্ডারদের সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী অবলীলাক্রমে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং সেনাবাহিনীকে গুলিয়ে ফেলতে পারেন:

> দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে সেনাবাহিনী সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন খবরের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, নেতিবাচক প্রচার সেনাসদস্যদের মনোবলে আঘাত করে। ...
> ...
> প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীকে জাতির গর্ব বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তার সরকার সেনাবাহিনীকে সব ধরনের সমালোচনার ঊর্ধ্বে রেখে *সার্বভৌমত্বের উজ্জ্বল প্রতীক* হিসেবে দেখতে চায়। ("সেনাবাহিনীর ফরমেশন কমান্ডারদের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী: প্রচলিত বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখুন", *প্রথম আলো*, প্রথম পাতা, ২৪শে নভেম্বর ২০০৯; বাঁকা হরফ বর্তমান রচনাকারের)।

এটা শুধু একজন প্রধানমন্ত্রীর মুখ-ফসকানো কথা নয়, এটাই 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' এর রাষ্ট্রীয় অবস্থান। রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্রকর্তা, মিডিয়া-মালিক ও সমাজপতিদের কলম-কণ্ঠ-নিঃসৃত এই অবস্থানের নথিবদ্ধ/দালিলিক প্রকাশ সুপ্রচুর। এর মানে হলো, খোদ জনগণের বিপন্নতাকে 'সার্বভৌমত্বের উজ্জ্বলতা' দিয়ে নিরাপদ করে তুলতে পারবে জনগণেরই সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটা সংস্থা—এ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী। আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধান যে বলছে: "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ" (অনুচ্ছেদ নং ৭; সংবিধান, ১৯৯৪: ৭), সেটা বাংলাদেশের জনসাধারণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণে উজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের মতো বিশাল একটা জনযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক-ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই বটে।]

এভাবে, সরকার যে 'সেনাবাহিনীকে সব ধরনের সমালোচনার ঊর্ধ্বে' রাখতে চায়, সেটা—সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক—আমাদের দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা-নাজুকতাকে উন্মোচিত করে তোলে। সামরিক বাহিনীর কর্মকাণ্ড যখন সেনাছাউনি পেরিয়ে বৃহত্তর সমাজের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তোলে (যেমন সামরিক আইন জারির মাধ্যমে, সুশীল-সামরিক জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে, অথবা 'কমান্ড ফেইলিওর' জনিত পরিস্থিতিতে সৃষ্ট বিডিআর-বিদ্রোহের মতো অবস্থা তৈরির মাধ্যমে), এমনকি তখনও নিজেদের আইন-আদালত-রাষ্ট্র-বিচার-সেনাবাহিনীর ভালোমন্দ নিয়ে 'দেশের মালিক' ওরফে জনসাধারণ কথা বললে, এবং মিডিয়ায় তার প্রকাশ ঘটলে, যদি তা "সেনাসদস্যদের [নাজুক][৪২] মনোবলে আঘাত করে", এবং সে কারণে (প্রধানমন্ত্রীর ঐ বক্তৃতা অনুযায়ী) যদি "সরকার শিগগিরই সেনাবাহিনী তথা প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রচার

---

[৪২] উদ্ধৃতি-চিহ্নের ভেতরে তৃতীয় বন্ধনীস্থিত শব্দ বর্তমান রচয়িতার।

সম্পর্কিত একটি সুস্পষ্ট গণমাধ্যম [নিষেধাজ্ঞা] নীতিমালা প্রণয়ন করবে” বলে সিদ্ধান্ত নেয়, সেনাবাহিনী তাহলে দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রের “ঊর্ধ্বে” উঠে যায়। এতে করে ‘দেশের মালিকের’ (অর্থাৎ জনগণের) মনোবল ও নিরাপত্তা বাড়ে না, বরং হ্রাস পায়। এই অবস্থায় কোনো সর্বশক্তিমান সেনাবাহিনীও দেশ-রাষ্ট্র-সমাজের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে না।[৪৩]

৭.৬ পাবলিক-প্রতিষ্ঠানে প্রাণ সঞ্চার করা দরকার

তাহলে, সেনাবাহিনীকে, সব সামরিক বাহিনীকে এবং সব বেসামরিক-কিন্তু-জনবিচ্ছিন্ন যে-বাহিনীগুলো আছে—প্রশাসনিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র, নির্বাহী বিভাগ, বিচার-বিভাগ—এগুলোর প্রাণ সঞ্চার করা দরকার। [০১:২৬:০০–০১:২৬:১৩]

সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন কিন্তু বিচার-বিভাগ, যেখানে বিচারকরা [সমাজ-প্রকৃতি-ঈশ্বরের দেওয়া] বিবেক-বিবেচনা-বুদ্ধি-বিশ্লেষণ দিয়ে বিচার করেন না [সেই সুযোগ বিদ্যমান আইন তাঁদেরকে দেয়ও না], কতগুলো মৃত আইন দিয়ে বিচার করেন তাঁরা [যেখানে মানুষ এবং বাস্তব ঘটনার চেয়ে কতকগুলো আইনী অক্ষরই আসলে প্রাধান্য পায়] এবং বিভিন্ন পাওয়ারফুল গোষ্ঠীর পক্ষেই সাধারণত যায় তাঁদের রায় [কেননা গরিব মানুষ টাকার অভাবে ভালো উকিল ধরতে পারেন না, দীর্ঘ দিন ধরে মামলা চালাতে পারেন না, সামান্য জামিনের জন্য হাইকোর্টে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারেন না।]। এই তো বিচারের অবস্থা। [বিচারবিভাগকে লোকনীতি ও লোকসমাজের যথাসম্ভব কাছাকাছি আসতে

---

[৪৩] **সেনাবাহিনীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা**: আমাদের দেশে একটি প্রতিষ্ঠানের—সশস্ত্রবাহিনীর—বাকি সমস্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্থাকে ছাড়িয়ে ক্রমাগতভাবে একচেটিয়া হয়ে ওঠার বিপজ্জনক লক্ষণ দেখা দিয়েছে বহু দিন ধরে। বিডিআর-বাহিনী, দমকল-বাহিনী, আনসার-বাহিনী, জেলখানা, বন্দর, সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ, পররাষ্ট্র-মন্ত্রণালয়, সিভিল সার্ভিস ইত্যাদির নির্বাহী পদগুলোতে সেনাবাহিনীর অফিসার নিয়োগদানের প্রক্রিয়া দীর্ঘ দিনের। বলতে গেলে, বাকি আছে পার্লামেন্ট, আদালত এবং বিশ্ববিদ্যালয় (এর মধ্যে ‘এক-এগারো’র জরুরি অবস্থার সময় অন্তত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনেকে ক্ষেত্রেই কর্নেল-মেজরদের অঙ্গুলিহেলনে বা টেলিফোনের ইঙ্গিতে চলেছে)। পাশাপাশি, সেনাবাহিনী নিজেই পরিণত হচ্ছে বিশাল এক কর্পোরেট বা কেন্দ্রীয়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ আর্থিক-বাণিজ্যিক সংস্থায়। সেনাকল্যাণ-সংস্থা, সেনা-মেডিকেল কলেজ, সেনা-বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি এরই নমুনা। এতে করে পুরো সমাজ জুড়ে একটা মাত্র প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক-সামরিক প্রভাব-প্রতিপত্তি তৈরি হয়। তৈরি হয় ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা। তৈরি হয় সেনাবাহিনীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা (পাকিস্তানে দীর্ঘকাল ধরে এই অবস্থার ফলে সেখানকার পরিস্থিতি কতটা বিভীষিকার আকার লাভ করেছে তার বৃত্তান্তের জন্য দেখা যেতে পারেঃ Ayesha Siddiqa, 2007।) সবাই জানেন, আমাদের দেশে এমনকি পার্লামেন্ট বা আদালতও এই একচ্ছত্র সেনাকর্পোরেট ক্ষমতার সামনে নতজানু হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়। এই সেনা-কর্পোরেট ক্ষমতা-পুঁজির সাথে দেশীবিদেশী (জাতিসঙ্ঘ) কর্পোরেট পুঁজি মিলিত হয়েই এবার ‘এক-এগারো’ নামক ভয়ঙ্কর স্বৈরতন্ত্র কায়েম হতে পেরেছিল। এই সার্বিক পাটাতন থেকেই তৈরি হতে থাকে সেনাবাহিনীর স্তুতি, দৃষ্টিকটু সেনাবন্দনা। বিডিআর-বিদ্রোহের পর সরকার, সুশীল-সমাজ ও মিডিয়ার কার্যকলাপের সর্বাঙ্গীন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে গেলে এই ‘সেনা-ফ্যাক্টর’কে বিশেষ বিবেচনায় না-নিয়ে উপায় থাকে না। আর, আশ্চর্যের কথা, বিডিআর-বিদ্রোহ কীভাবে কীভাবে যেন এই ‘সেনা-শ্রেয়ত্বের অহম’ এ আঘাত হেনেছে; প্রকারান্তরে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে নিরঙ্কুশ সেনা-ক্ষমতাকে।

হবে ।] [০১:২৬:১৩–০১:২৬:৫১]

এই সব প্রতিষ্ঠানগুলোই কিন্তু (সামরিক-বেসামরিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো) জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, বঞ্চনা-ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে, জীর্ণ হয়ে পড়েছে। এগুলোতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করা দরকার। সেটার উপায় হচ্ছে স্বাধীনতা, পারস্পরিক সমঝোতা, ভালোবাসা, পারস্পরিক দরদ, এবং জনসম্পৃক্ততা। সব ক্ষেত্রে জনগণকে সম্পৃক্ত হতে হবে। গোয়েন্দাগিরি যদি জনগণ না করে, কে গোয়েন্দা কোন গোয়েন্দা বাংলাদেশকে বাঁচাবে? যদি কোনো গোয়েন্দাগিরি করতে হয়, জনগণকেই করতে হবে। জনগণ যদি বন্দুকধারী লোকদেরকে চোখে চোখে না রাখতে পারে, তারা কী করছে, কাকে ধরছে, কাকে মারছে, কেন মারছে, কাকে ধরছে, কেন ছাড়ছে—এগুলো যদি জনগণ না জানে, তাহলে বন্দুকধারী বাহিনীগুলো জনগণকেও মারবে, ধরবে; এবং জনগণ তার নিপীড়নের শিকার হবে, হচ্ছে। [০১:২৬:৫২–০১:২৭:৪০]

৭.৭ পাবলিক-প্রতিষ্ঠানে জনগণের নজরদারি দরকার

ফলে, ক্ষমতা প্রয়োগের যত পকেট আছে—ক্ষমতা যেখানে ঘুমায়, যেখানে থাকে, যেখানে বসে, যে চেয়ারে, যে বিছানায়—এগুলোকে জনগণের নজরদারির আওতায় রাখতে হবে। জনগণের কাছে যেন এরা কমপ্লিটলি ট্রান্সপারেন্ট থাকে। যেন তারা জানে যে ওখানে কী হচ্ছে। যেন আমি জানি প্রতিদিন র‍্যাব-অফিসে কাকে ধরে আনা হয়। তার ফ্যামিলি এ সম্পর্কে কী বলে? তার ভাইবোনেরা এ সম্পর্কে কী বলে? তার গ্রামবাসীরা কী বলে—ভিকটিমের? আমরা তো শুনতে পাই না। আমরা শুধু র‍্যাবের একটা গল্প পাই: এরা খারাপ লোক, এদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে; বা এরা মারা গেছে, আমরা মারি নি, গোলাগুলিতে মারা গেছে।[৪৪] [০১:২৭:৪১–০১:২৮:১৯]

৭.৮ সেনাবাহিনীর গণতন্ত্রায়ন ও জনমুখীনতার ধারণা

আমি আগে বলেছি, তারপরও আরেকবার বলি: যেকোনো প্রতিষ্ঠান (মিডিয়াও—মিডিয়ার কথাটা এর আগে বলি নি) যদি গণতান্ত্রিকভাবে চলে (তুলনামূলক অর্থে), তাহলে যত বেশি গণতান্ত্রিক হওয়া যায়, যত বেশি তার সব মেম্বারদের স্বাধীনতা বাড়ানো যায়, তত বেশি ঐ প্রতিষ্ঠান ভালো চলে—এমন কি আর্মিও। ডেমোক্রেটিক আর্মির ধারণাই তো আমাদের মাথার মধ্যে নাই! আমরা মনে করি আর্মি মানেই 'চেইন অফ কমান্ড'। একদম কঠোর হুকুম ছাড়া ওখানে কোনো নিয়ম থাকবে না। ওখানে

[৪৪] নতুন একটা বই বেরিয়েছে: *ক্রসফায়ার: রাষ্ট্রের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড* [ঢাকা: ঐতিহ্য প্রকাশনী]। মোটা একটা বই—প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার। নিসার আহমেদ এটা সম্পাদনা করেছেন। ফরহাদ মজহার ভূমিকা লিখেছেন। এখানে ক্রসফায়ারে যারা মারা গেছে, র‍্যাব-পুলিশের ক্রসফায়ারে, এরকম অনেক মানুষের ভাই-বোন-মা-বাবা-গ্রামবাসীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় মানুষের মুখের ভাষাটাই হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে। ঐ সমস্ত পার্টির পক্ষ থেকে যা আমরা জানতে পারি না কোনোদিন—তাদের লিফলেট, তাদের বক্তৃতা, তাদের সাক্ষাৎকার, এগুলোও এখানে আছে। বামপন্থী বিদ্রোহীদেরকে নিয়েই আলোচনা হয়েছে: মানে বামপন্থী রাজনৈতিক দল, যারা 'জনযুদ্ধ', 'পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি', 'বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি', বামধারার আন্ডারগ্রাউন্ড যে-রাজনৈতিক দল, তাদের নিহত নেতাদের-কর্মীদের নিয়েই এই বইটা হয়েছে। [১:২৮:২০–১:৩১:০৭]

স্বাধীনতা থাকবে না। ওখানে ভালোবাসা থাকবে না। পারস্পরিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে না। পারস্পরিক মেলামেশা থাকবে না। জওয়ানরা এবং অফিসাররা বিচ্ছিন্নভাবে থাকবেন; জওয়ানদের থাকার জায়গা আর অফিসারদের থাকার জায়গা আলাদা থাকবে, এগুলোই আমরা স্বাভাবিক মনে করেছি। কিন্তু আর্মির পক্ষে, সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, ডেমোক্রেটিক হওয়া সম্ভব। অনেক বেশি ডেমোক্রেটিক হওয়া সম্ভব। [মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের আর্মি অনেক বেশি ডেমোক্রেটিক ও জনঘেঁষা ছিল। আর্মি ও জনগণ ভালো বোঝাপড়া ছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু অচিন্ত্যনীয় বিপুল আয়তনে সাধিত সুবিশাল গণবিদ্রোহেরই ঐতিহাসিক অভিপ্রকাশ (সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৯)। মুক্তিযুদ্ধের পরে আমাদের কর্নেল তাহেরও সেনাবাহিনীর আমূল সংস্কারের প্রস্তাব হাজির করেছিলেন। রুশবিপ্লবের সময়কালে, গণতান্ত্রিক ও পারস্পরিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং সিপাহী-অফিসার-বিভক্তিবিহীন আর্মির ধারণা তুলে ধরেছিল ইউক্রেনের নৈরাজ্যবাদীদের তথা মুক্তিপরায়ন কমিউনিস্টদের 'মাখনো আর্মি' [Makhno FAQ, 2010]।] [০১:১৪:০৫–০১:১৫:০০]

ফজলুর রহমান বললেন, যুদ্ধের সময় বিডিআর থাকবে সেনাবাহিনীর কমান্ডে। এটা তো একটা বাহিনীর জন্য মর্যাদাকর না। যদি আমাকে আলাদা-আলাদা বাহিনী করতেই হয়, তাহলে পরে তাদেরকে আলাদা-আলাদা মর্যাদা, সমান ধরনের মর্যাদা দিতে হবে। আর, না-হলে, আলাদা-আলাদা বাহিনী করার দরকারটা কী? সেনাবাহিনীরই একটা অংশ—তারা সীমান্তে থাকবে। আমার সিঙ্গেল একটা বাহিনী থাকবে। আমার আলাদা করে র‍্যাব, আলাদা করে পুলিশ, আলাদা করে সেনা—এগুলোর তো প্রয়োজন নাই। সিঙ্গেল একটা বাহিনী হওয়া সম্ভব—তাই না? —যে-বাহিনীর একটা শাখা হচ্ছে বিমান, একটা শাখা হচ্ছে নৌ, একটা শাখা হচ্ছে গোয়েন্দা, একটা শাখা হচ্ছে সিভিলিয়ান, একটা শাখা হচ্ছে সীমান্ত। তাহলে তো আমার 'এই-বাহিনী-বনাম-ঐ-বাহিনী' যে-মর্যাদার সংকট, খুব ভয়ঙ্কর মর্যাদার সংকট, সেটা আর থাকে না। বাই চান্স—এই বিদ্রোহ দেখিয়ে দিল—বাই চান্স দুই বাহিনী যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহলে বাংলাদেশ শেষ। এমন সংকটে বাংলাদেশ পড়বে যেটা পার হয়ে আসা আমাদের জন্য কঠিন হবে। [০১:৩১:১৭–০১: ৩২:২০]

৭.৯ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব যথেষ্ট নয়—দরকার সামাজিক গণতন্ত্রের ধারণা ও প্রতিষ্ঠান

প্রায় স বক্তাই টক-শোতে বলেছেন বা পত্রিকাতে লিখেছেন-টিখেছেনও। তাঁদের একটা মূল মত হচ্ছে এরকম যে, সব রাজনৈতিক দল মিলে এটা সমাধান করা দরকার। একটা সর্বদলীয় ঐক্য দরকার। হ্যাঁ, এটা এই মুহূর্তে দরকার। এটা বিদ্যমান জাতিগত-রাষ্ট্রগত ঐক্যকে আরও বাড়াবে। কিন্তু, একই সঙ্গে এটাও খেয়াল করা দরকার (এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট) যে, সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেরকম অফিসাররা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন (আসলে খোদ সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, বিচ্ছিন্ন করে গড়ে তোলা হয়েছে, ঐভাবে গড়ে তোলাটাকেই ভালো মনে করা হয়েছে), একইভাবে কিন্তু বেসামরিক প্রশাসনও জনগণ থেকে

বিচ্ছিন্ন। বেসামরিক প্রশাসনের অফিসাররাও তাদের 'র‍্যাঙ্কস-অ্যান্ড-ফাইলস', নিম্ন স্তরের আপামর বাহিনীর মেম্বারদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। এবং প্রশাসন নিজে, প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমলাতন্ত্র, প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজনীতি, প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজনৈতিক দল, এগুলোও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে অনেকখানি। সুতরাং, আমি যদি মনে করি যে, এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য সব দল মিলে একটা ঐক্য করলেই হবে, তাহলে সেটা ভুল। কারণ, সব দলের এই ঐক্য জনগণের সঠিক প্রতিনিধিত্ব না-ও করতে পারে। কারণ, তারা খুব সীমিত অর্থেই জনগণের 'প্রতিনিধিত্ব' করে। রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিনিধিত্ব করে বড়লোকদের, বড় বড় পুঁজির এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের বড় বড় স্বার্থের। অর্থনৈতিক খাতের বড় এলিট রাজনৈতিক খাতের বড় এলিটদের সাথে ঐক্য স্থাপন করে, সামরিক খাতের বড় এলিটদের সাথে ঐক্য স্থাপন করে। ফলে, শুধু রাজনৈতিক দলগুলো মিলে একটা ঐক্য স্থাপন করলেই (তথা পার্লামেন্টে একটা ঐক্য হয়ে গেলেই) 'জনগণের প্রতিনিধিত্ব' করা হয় না। এই পার্লামেন্টে জনগণ কিন্তু নাই। এম. এন. লারমা, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের কিংবদন্তী নেতা, আমাদের প্রথম পার্লামেন্টে পরিষ্কার বাংলায় বলছিলেন: এই পার্লামেন্ট রিকশাওয়ালার না, এই পার্লামেন্ট মাঝির না, কৃষিজীবীর না, এই পার্লামেন্ট শ্রমিকের না, এই পার্লামেন্ট জনগনের না [মঙ্গল কুমার চাকমা, ২০০৯: ২১১]। [২য় অডিও-ফাইলের ০০:০১:১৮–০০:০৩:৩২]

এই পার্লামেন্ট তো জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের সংগঠন না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সামরিক বাহিনীগুলোও জনগণের বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠছে না। জনগণের বাহিনীর মতো করে, জনগণের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না। রাজনৈতিক দলগুলোও জনগণের দল হিসেবে গড়ে ওঠে নি, জনগণ দ্বারা পরিচালিতও হচ্ছে না। মূল সংকট একই রকম। [২য় অডিও-ফাইলের ০০:০৩:৩৩–০০:০৩:৫৬]

ফলে, এখানে যারা শুধু বলে যাচ্ছেন যে, রাজনৈতিক দল পার্লামেন্টে আলোচনা করুক, বিরোধী দলকে নিয়ে বসুক, সব দলকে নিয়ে বসুক, আলোচনার দিকে যাক, বলপ্রয়োগে না-যাক—এগুলো সব ঠিক আছে, এই মুহূর্তের জন্য করা দরকার। কিন্তু, একই সঙ্গে সমাজকে নীতিগতভাবে, ভবিষ্যতের জন্য ভাবতে হবে যে, আমাদের এমন ধরনের প্রতিনিধিত্ব, এমন ধরনের প্রতিনিধিসভা তৈরি করতে হবে, যে-প্রতিনিধিসভা প্রকৃতপক্ষেই দেশের সব পেশার সব স্তরের আপামর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। [২য় অডিও-ফাইলের ০০:০৩:৫৭–০০:০৪:৩৫]

ধরা যাক, শুধু রিকশাওয়ালাদের সংগঠন। সারা বাংলাদেশে যত রিকশাওয়ালা আছে, শুধু তাদের একটা সংগঠন। এখানে দল-মত নাই। এখানে অন্য কিছু নাই। রিকশাওয়ালা-মাত্রই এই সংগঠনের মেম্বার। এখানে বিএনপি-আওয়ামী লীগ থাকবে না, সামরিক-বেসামরিক থাকবে না, সমাজতন্ত্র-পুঁজিবাদ-ইসলাম থাকবে না। এখানে মূল কথা হচ্ছে, রিকশাওয়ালাদের মানুষ হিসেবে ভালো বেঁচে থাকা, ভালো খেতে-

পরতে পারা, ভালো ব্যক্তি হিসেবে থাকা, তাদের ছেলেমেয়েদের সব কিছু মঙ্গলজনকভাবে পরিচালিত হতে পারা। এমন সংগঠন তো নাই রিকশাওয়ালাদের! এ রকম সংগঠন যদি থাকত, তাহলে সেই সংগঠনের লোকেরাই রিকশাওয়ালার প্রতিনিধিত্ব করতে পারত। ঐ সংগঠনের লোকেরা যদি রিকশাওয়ালার প্রতিনিধি হিসেবে রিকশাওয়ালাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে একটা প্রতিনিধিসভায় বসতেন, এবং যদি দেশের রিকশাওয়ালাদের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ঐ প্রতিনিধিসভার থাকত, তাহলে পরে সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব হয়েছে বলা যেত। [২য় অডিও-ফাইলের ০০:০৪:৩৬–০০:০৫:২৯]

তার মানে আমাদের এই যে সংকট, যে-সংকট বিডিআর-বিদ্রোহ উন্মোচিত করেছে, সে-সংকটে মূল সমস্যার একটা কোণা উন্মোচিত হয়েছে মাত্র। সংকট প্রকৃতপক্ষে অনেক বড়, অনেক সর্বগ্রাসী। সমাজগ্রাসী, রাষ্ট্রগ্রাসী সংকটের জমি তৈরি হয়ে আছে। সেটা সমাধান করার জন্য জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বমূলক সভা, প্রতিষ্ঠান, জনসংগঠন, এগুলো গড়ে তুলতে হবে। খোদ রাজনৈতিক দল তার নিজেদের কর্মীদেরই প্রতিনিধিত্ব করে না। আওয়ামী লীগের, ছাত্রলীগের আপামর যে-ছোট-ছোট কর্মীরা, এরাই তো বঞ্চিত বোধ করে। এবং সেটা সব দলেই। বিএনপিতে, জামাতে ইসলামীতে, কমিউনিস্ট পার্টিতে। 'জনযুদ্ধে'র যে-লোকটা 'শহীদ' হচ্ছে, অপারেশন চালাতে গিয়ে, সে জানে না, পার্টির মূল নেতা কে। কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তার নিজের হাতে সিদ্ধান্ত নাই। সিদ্ধান্ত আছে নেতাদের হাতে। জেএমবি-র সিদ্ধান্ত 'জঙ্গি'দের হাতে নাই। আছে 'মজলিশে শুরা'র হাতে। দলগুলো নিজেরা নিজেদের কর্মী থেকেই বিচ্ছিন্ন। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন তো বটেই। তার মানে, সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের যে-ধারা আছে, যে-গণতন্ত্র আছে, সেটা শুধু 'রাজনৈতিক গণতন্ত্র'। এটা হচ্ছে 'রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব'[৪৫]। [২য় অডিও-ফাইলের ০০:০৫:৩০–

[৪৫] 'রাজনৈতিক প্রতিনিধি'দের কাজ হচ্ছে 'রাজনীতি করা': সমাজ-নিয়ন্ত্রণের ও পরিচালনার কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা-বন্দোবস্তের অংশীদার হওয়া, ক্ষমতাবান হওয়া, এবং ক্ষমতার বিদ্যমান বিন্যাসকে বৈধতা দিতে থাকা। মুখে ও কাগজে-কলমে বলা হলেও, আইন প্রণয়নের বা প্রয়োগের কোনো ক্ষমতা এদের হাতে বাস্তবে থাকে না। এই ক্ষমতা থাকে আদতে নির্বাহী বিভাগ বা রাষ্ট্রকর্তাদের হাতে। রাষ্ট্রকর্তারা (অর্থাৎ, রাষ্ট্র-ম্যানেজারগণ এবং আইনশৃঙ্খলা-নিরাপত্তাবাহিনীর সুপার-এলিট হুকুম-কর্তারা) এমনকি রাজনৈতিক দল বা নিজ শ্রেণীর গোষ্ঠী-ব্যবসায়িক স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে তাদেরকে নির্যাতন-নিপীড়ন-পঙ্গু করার ফ্যাসিবাদী ধারা পর্যন্ত অবলম্বন করে বসতে পারে, যদি ক্ষমতা অল্প কিছু লোকের হাতে অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। রাজনৈতিক গণতন্ত্র সব সময়ই কেন্দ্রীভূত কতিপয়তন্ত্র। এর বাস্তব পরিণাম হয় দুর্বিষহ: গায়ের জোরে বা ভোটে নির্বাচিত হয়ে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী দল-গোষ্ঠী-শক্তি বিদ্যমান রাষ্ট্রের মৌল চরিত্র (অর্থাৎ ব্যক্তির শ্রমের ওপর পুঁজির অর্থনৈতিক শোষণ এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার ওপর কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের রাজনৈতিক আধিপত্য) বদলাতে পারে না, বদলাতে চায়ও না। বলশেভিক রাশিয়ার কর্তৃত্বপরায়ন সমাজতন্ত্র বা শরিয়তী-যাজকতন্ত্রী ইরানের কর্তৃত্বপরায়ন ইসলামের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠী-শক্তি এই কারণেই ব্যর্থ হয়। (এ রকম একচেটিয়া কতিপয়তন্ত্রের সাম্প্রতিকতম সংস্করণ হচ্ছে আমাদের সুশীল-সামরিক জরুরি জমানার ইয়াজউদ্দিন-ফখরুদ্দিন-মঈনউদ্দিনের জেল-জুলুমে-জরিমানার সরকার।) সুতরাং, 'রাজনৈতিক পন্থা'য় সমাজের মৌলিক মুক্তিপরায়ন রূপান্তর ঘটানো সম্ভব নয়। এ রকম কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব কেবল 'আর্থ-সামাজিক পন্থা'য়, সামাজিক সংগঠন-

০০:০৬:৪৬]

আমাদের দরকার ‘সামাজিক গণতন্ত্র’। [এই ধরনের গণতন্ত্রকে ‘প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র’ও বলা হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্যঃ Doyle, Kevin, 1997] এখানে গোটা সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিরা থাকবে। সমাজ নিজে তাদের নিজেদের প্রতিনিধিদেরকে নির্বাচিত করবে। এবং সেই প্রতিনিধিদের সভা (কেন্দ্রে এবং সারা দেশে) তারাই দেশ পরিচালনা করবে, তারা বুঝে দেখবে, অন্য প্রতিষ্ঠান তাদের লাগে কি লাগে না। আমাদের তো আসলে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনই নাই। এ রকম সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন নাই। এ রকম সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন বেসামরিক প্রশাসনিক বাহিনীর প্রয়োজন নাই। আমাদের দরকার জনগণের নিজেদের সংগঠন, নিজেদের সংস্থা, এবং প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্ব-কাঠামো। এই ধরনের সামাজিক গণতন্ত্রই গড়ে তুলতে হবে আমাদের। [২য় অডিও-ফাইলের ০০:০৬:৪৭–০০:০৭:২৬]

[ক্লাসরুম-বক্তৃতা সমাপ্ত]

সংস্থা-বন্দোবস্ত ও প্রতিষ্ঠানসমূহের আমূল আর্থিক-সামাজিক পরিবর্তনের পথে।

উত্তর-লিপি

রথ, রশি, এবং সম্বন্ধের অসাম্য দূরীকরণের প্রশ্ন

নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রথের রশি", ১৪০২ বঙ্গাব্দ: ২৬৯

পরিশেষে, বিদ্রোহের এক বছরের মাথায় এসে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রথের রশি" নাটকের দিকে আমি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। খোদ নাট্যকারের ভাষ্যে নাটকের বিষয়টি এই—

> রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে নিপীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহন রূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রথের রশি", ১৪০২ বঙ্গাব্দ: ৬৭৮)

এবারে নাটকের কিছু সংলাপ তুলে ধরতে চাই, তারপর সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে দুয়েকটা সাধারণ মন্তব্য পেশ করা যাবে:

> প্রথম ধনিক
> আমাদের শেঠজিকে ডেকেছেন রাজা।
> সবাই আশা করছে, তাঁর হাতেই চলবে রথ।
>
> দ্বিতীয় সৈনিক
> সবাই বলতে বোঝায় কাকে বাপু?
> আর তারা আশাই বা করে কিসের।
>
> দ্বিতীয় ধনিক
> তারা জানে আজকাল চলছে যা কিছু
> সব ধনপতির হাতেই চলছে।
>
> প্রথম সৈনিক
> সত্যি নাকি! এখনি দেখিয়ে দিতে পারি, তলোয়ার চলে আমাদেরই হাতে।
>
> তৃতীয় ধনিক
> তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে।
> ...
>
> প্রথম নাগরিক

ওদের [ধনপতিদের] সাথে পারবে না তর্কে।

প্রথম সৈনিক
কী বলো, পারব না !
সবচেয়ে বড়ো তর্কটা ঝন্‌ঝন্ করছে খাপের মধ্যে।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "রথের রশি", ১৪০২ বঙ্গাব্দ: ২৬৩–২৬৪)

পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতি-সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন-প্রক্রিয়ার ওপর সেনাবাহিনীর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে, যাঁরা তাঁদের সহকর্মীদের নির্মম হত্যাকাণ্ড ও অপমান-অপবাদের প্রতিশোধ নিতে বিদ্রোহীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পথে ইতোমধ্যে বহু দূর অগ্রসর হয়েছেন, যাঁদের "সবচেয়ে বড়ো তর্কটা [তলোয়ারের মতো] ঝন্‌ঝন্ করছে খাপের মধ্যে"। অথচ, আইএসপিআর-এর বিজ্ঞপ্তিতে বিডিআর বাহিনীর দীর্ঘদিনের গৌরবের দোহাই দিয়ে গোলাগুলি থামাতে বলা হয়েছিল (New Age, 2009)। কিন্তু পরে, বলতে গেলে প্রথম সুযোগেই, 'দুই শত বছরের গৌরবময়' সেই বাহিনীটিকে 'পুনর্গঠনের' নামে কার্যত বিলুপ্ত করে দিয়ে তার জায়গায় 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' প্রতিস্থাপন করার কাজ শুরু করা হলো।

আশ্চর্যের কথা—এরকমটা ঘটার আশংকাই করেছিলেন বিডিআরের বিদ্রোহীরা তাঁদের দাবিনামার ৫০ নং দফায়: "দেখে মনে হচ্ছে, ইতিহাস থেকে এই সংগঠনের নাম মুছে ফেলার জন্য সেনা-অফিসাররা মরিয়া হয়ে উঠেছেন" (দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট ১)। হয়ত কাকতলীয় কথাই। তথাপি, এই বাক্যটা থেকে ষড়যন্ত্র তো দূরের কথা, বিডিআর-বাহিনীটার প্রতি বিদ্রোহী সদস্যদের গভীর মমতার অনুভূতিই বরং ফুটে উঠতে চায়। কিন্তু, বিডিআর-বাহিনীকে বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহোত্তর প্রচ্ছন্ন ব্যাকুলতা, প্রশ্নাতীত সম্মতি ও পূর্ণাঙ্গ দৃঢ়তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়: বিদ্রোহটা স্রেফ কতিপয় বিপথগামী/ষড়যন্ত্রী সৈনিকের কর্ম নয়, গত বছরের ফেব্রুয়ারি-বিদ্রোহে গোটা বিডিআর-ই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল; সুতরাং বিডিআরের নাম-নিশানাও রাখা যাবে না। আবারও প্রমাণিত হলো: এটা ছিল প্রকৃতই স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহ।

বিডিআর বিদ্রোহের এই বিশেষ প্রকৃতিই সরকারকে 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করার সুযোগ করে দিয়েছিল। অথচ পরে আমরা দেখলাম, বিদ্রোহী বিডিআরের জন্য খোদ প্রধানমন্ত্রীর 'জাতির উদ্দেশে ভাষণ' এ ঘোষিত 'সাধারণ ক্ষমা' বাতাসে মিলিয়ে গেল। বিদ্রোহীদের দাবিদাওয়া-অভিযোগ নিয়ে কোনো তদন্ত হলো না। অথচ তখন "বিডিআর সদস্যরা সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছে, তার কারণ তদন্ত করে দেখতে হবে ... উত্থাপিত সকল অভিযোগ সরকার খতিয়ে দেখবে ..." এমনটাই ছিল জনসাধারণ ও নাগরিক সমাজের সুস্পষ্ট অভিমত (তেহরান বাংলা রেডিও, ২০০৯)। সরকারও তা স্বীকার করেছিল, তদন্তের কথা বলেছিল। এরকম একটা আন্তরিক রাষ্ট্রীয় তদন্তের পথেই কেবল সবচাইতে উপকার হতে পারত বিডিআরের এবং পুরো দেশের।

বিদ্রোহীদের কাছে 'অন্য' বাহিনী হিসেবে পরিগণিত সেনাবাহিনীর অফিসারদেরই পূর্ণ কর্তৃত্বে পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে বিদ্রোহীদেরকে পরাস্ত করার মনোবৃত্তি

সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এর সর্বনাশের দিকটা কেউ ভাবল বলে মনে হলো না।[৪৬] বলা হলো, বিদ্রোহের বিচার আপাতত বিডিআর-আইনে এবং প্রচলিত আদালতে হলেও ভবিষ্যতে এই বাহিনীতে বিদ্রোহ হলে তার বিচার হবে খোদ সেনাআইনে ("ভবিষ্যতে বিদ্রোহ হলে সেনা আইনে বিচারঃ এবার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল ও বিডিআর আইনে", *প্রথম আলো*, ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৯, প্রথম পাতা, ওপরের ভাঁজে বাম দিকে)।

বিদ্রোহের দাবিনামায় বিডিআর-বাহিনী মানবাধিকারের কথা তুলেছিল (দফা নং ৪৫, 'পরিশিষ্ট ১' দ্রষ্টব্য)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাম ব্যবহার করে গোটা পিলখানাকে জেলখানা বানিয়ে, নির্যাতন-কেন্দ্রে পরিণত করে, সেখানে 'আত্মহত্যা' ও 'অস্বাভাবিক মৃত্যু'র তালিকা দীর্ঘ করে সেই মানবাধিকারকে পুরোপুরি অবজ্ঞা হলো। তারপর, "নতুন আইনের খসড়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মইনুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, ... মানবাধিকারের দিকে বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে।" সেই মোতাবেক "বর্তমানে প্রচলিত বাংলাদেশ রাইফেলস অর্ডার ১৯৭২ ও বাংলাদেশ রাইফেলস (স্পেশাল প্রভিশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ বিলুপ্ত করার প্রস্তাব রেখে নতুন আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এ আইনটি [অনুসারে] বাংলাদেশ রাইফেলসের বদলে প্রস্তাবিত নতুন নাম 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০০৯' নামে অভিহিত হবে।" (কামরুল হাসান ২০০৯-খ)। প্রস্তাবিত আইনের খসড়ায় বলা হলো, "বিদ্রোহে উসকানির শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড" (কামরুল হাসান ২০০৯-খ)। শুধু তাই নয়, "বিদ্রোহে জড়িত থাকা বা সহযোগিতা করার সর্বোচ্চ শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড ... বিদ্রোহে বাধা না দিলেও এই সাজা প্রযোজ্য হবে" (কামরুল হাসান ২০০৯-খ)।

এসব সত্ত্বেও একথা ঠিক যে, সেনা-আইনে বিডিআর-বিদ্রোহের বিচারের জন্য সামরিক বাহিনীর প্রবল চাপ সামলানোর ক্ষেত্রে প্রসঙ্গটাকে সুপ্রিম কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া, সুপ্রিম কোর্টে তা নিয়ে সুদীর্ঘ প্রকাশ্য আলোচনার প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করা, শেষে "বিডিআর বিদ্রোহের বিচার সেনা আইনে সম্ভব নয়" (*প্রথম আলো*, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৯, প্রথম পাতা, ওপরের ভাঁজে ডান দিকে) মর্মে সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে রায় পাওয়া, এবং প্রচলিত আইনে দণ্ডবিধির আওতায় 'দ্রুত বিচার বিশেষ ট্রাইবুনাল আইন ২০০২' এর পাশাপাশি বিডিআর আইনের অধীনে বিডিআরের বিশেষ আদালতে বিদ্রোহের বিচার সম্পন্ন করার কাজ শুরু করার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নিঃসন্দেহে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। তথাপি, যে-সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহীদের কাছে মনে হতো 'ওরা', সেই 'ওদের' হাতে এখন 'বিচার' চলছে বিদ্রোহীদের।

গ্রেপ্তার, রিম্যান্ড, জিজ্ঞাসাবাদ ও স্বীকারোক্তি সংক্রান্ত সামগ্রিক এই বিচারিক পরিস্থিতি নিয়ে সোজাসাপ্টা কথা লিখেছেন শাহদিন মালিক উপযুক্ত শ্লেষের সাথে:

---

[৪৬] বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক শাহদীন মালিকের একটি লেখার সূত্র ধরেই মূলত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক আসিফ নজরুলের বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্যঃ

> ... আমাদের আসল সর্বনাশের দ্বিতীয় পর্ব রচিত হচ্ছে সম্ভবত বিডিআরের অভ্যন্তরেই। অস্বাভাবিক মৃত্যু, নির্যাতন ... এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গণহারে বিডিআর সদস্যদের জেলে পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনা। সারা দেশে ১৪টি মামলা হয়েছিল বিডিআর সদস্যদের বিরুদ্ধে, কিছুদিন ধরে দায়ের করা হচ্ছে নতুন নতুন আরও মামলা। গত এক সপ্তাহে কর্মস্থল, বাড়ি, এমনকি প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে হঠাৎ হঠাৎ বিপুল সংখ্যায় গ্রেপ্তার হচ্ছেন তাঁরা।
>
> দীর্ঘ সারিতে দাঁড়ানো গ্রেপ্তারকৃত এইসব জওয়ানের নতমুখো ছবি পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে এখন নিয়মিতভাবে। এসব দেখে মনে হয়, কোথাও কি মারাত্মক কোনো ভুল করছি আমরা? ... এই ভুলের ভয়ঙ্কর মাশুলের কথা কি ভেবে দেখছি আমরা দূরদর্শীভাবে? (আসিফ নজরুল, ২০০৯)

... আমাদের সভ্য দেশে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একজন করে জওয়ান মারা যাচ্ছে। বিডিআর মসজিদের ইমাম সাহেবও মারা গেছেন হার্ট অ্যাটাকে। ...

অপারেশন ক্লিন হার্টে অনেক লোক হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছিল। যৌথ বাহিনী গ্রেপ্তার করলেই হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুবরণ।

... সন্দেহভাজন প্রচুর বিডিআর জওয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অনুশোচনার তাড়নায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে প্রায় শ খানেক বিডিআর জওয়ান ইতিমধ্যে তাদের দোষ স্বীকার করেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ১৬৪ ধারা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে মেনে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। আমি নিশ্চিত, স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ডকারী কোনো বিচারক এসব বিডিআর জওয়ানকে নির্যাতন করার বিন্দুমাত্র আলামত বা নিদর্শন লক্ষ করেন নি। কিছু তাঁদের চোখে পড়েনি।

...

... গ্রেপ্তারের আগেই সন্দেহভাজন জওয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হচ্ছে, নির্যাতন করা হচ্ছে। তারপর গ্রেপ্তার দেখানো হচ্ছে। আবার রিম্যান্ডে নেওয়া হচ্ছে। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করছেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা অকাতরে। ...

...

পত্রিকায় পড়েছি, হাজার খানেক বিডিআর জওয়ানকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। এত লোকের বিচার করা সম্ভব নয়। বছরের পর বছর পেরিয়ে যাবে অভিযুক্ত কোনো জওয়ানের একজন আইনজীবী না থাকলেও। অনেক বছর বিচার হওয়ার পর অনেকে ছাড়াও পেয়ে যেতে পারেন। ট্রায়াল কোর্টে বিচারে মৃত্যুদণ্ড হলে হাইকোর্ট-অ্যাপিলেট ডিভিশনে আপিল হতে হবে। তাতে আরও সময় লাগবে, অনেকে ছাড়া পেয়েও যাবেন।

এত ঝক্কি-ঝামেলার কী দরকার? যেভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তার গতি আর কার্যকারিতা বাড়িয়ে দিলেই হয়।

পিলখানায় সেনা কর্মকর্তাদের খুন তো আর বাইরের লোক করেনি। বিডিআর জওয়ানেরাই করেছে। কেউ ছিল সরাসরি সম্পৃক্ত, আর কেউ পরোক্ষভাবে, শাস্তি তো হতেই হবে। বিচার-আচারে গেলে কিছু দোষী 'আইনের ফাঁক-ফোকরে' বেরিয়ে যাবে।

অতএব যেভাবে চলছে সেভাবেই চলুক। ইতিমধ্যে যারা স্বীকারোক্তি দিয়েছে তাদের আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ফের রিম্যান্ডে আনা হোক। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠিয়ে দেওয়া হোক মৃত ঘোষণা করার জন্য।[৪৭] আর কিছু আইন অনুযায়ী হোক বা না হোক, মৃত্যুর যাতে একটা অফিসিয়াল সার্টিফিকেট পাওয়া যায় সেজন্য মেডিকেলে নেওয়া জরুরি।

... বিডিআর হত্যার তদন্তে পুলিশ সিআইডি দিয়ে স্পষ্টত কাজ হচ্ছে না। সেনাবাহিনী তদন্ত করছে। সংবিধানেই আছে সংবিধানের মৌলিক অধিকার সেনাবাহিনীর বেলায় প্রযোজ্য নয়। ফৌজদারি কার্যবিধি আর হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট পুলিশের জন্য, সেনাবাহিনীর জন্য নয়।

পুলিশকে দিয়ে পুলিশের কাজ আর হচ্ছে না। সেনাবাহিনীই পেরেছে আর পারবে দেশে অপরাধ, দুর্নীতি, হত্যা, সন্ত্রাস রোধ ও দমন করতে। তাদের আপন কায়দায়। নির্যাতিত জওয়ানদের অনেকে আদালতে তাদের নির্যাতনের কথা বলেছে। জানামতে কোনো আদালতই আমলে নেননি। আব্দুল জলিল বলেছেন, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেছেন, বিদিশা তার বইতে লিখেছে।

এসব বলাবলি লেখালেখির বোধ হয় আর দরকার নেই। অকথ্য নির্যাতন আর তারপর খুন—সেটা হার্ট অ্যাটাকে হোক ক্রসফায়ারে হোক বা নির্যাতনের কারণে হোক, তাতে কিছু আসে যায় না—অপরাধীকে মারাটাই বড় কথা। এটাই হোক এ সমাজের মূল আইন। আর পুলিশের কাজটা বেশি বেশি করে সেনাবাহিনীকেই দেওয়া হোক। (শাহদীন মালিক, ২০০৯)

---

[৪৭] এ ব্যাপারে "অ্যামনেস্টি বলেছে, ঐ ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে অনেক জওয়ানকে আটক করা হয়। ঐ জওয়ানদের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, আটক করার পর জ্ঞিাসাবাদের নামে তাঁদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছে। নির্যাতনে অনেকে মারা গেছেন। এ সংখ্যা কমপক্ষে ৪৮।" ("পিলখানার ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিতের আহ্বান অ্যামনেস্টির", *প্রথম আলো*, প্রথম পাতা নিচের ভাঁজে বামে, ১৩ই নভেম্বর ২০০৯)

বিচার-কার্য, সার্বিক বিদ্রোহ-প্রপঞ্চ এবং বিদ্রোহ-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের আরো অনেক দিক নিয়ে আলাদা আলাদা প্রবন্ধ রচনা করতে হবে। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের ভরসায় একটা কথা বলেই ফেলা যায়: "তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।" নইলে যত কঠোর বিদ্রোহরোধী আইনই প্রণয়ন করা হোক না কেন, বিদ্রোহের ভূত আমাদের তাড়া করে ফিরবে, সমাজের সর্বত্র।

মানুষের চিরকালাগত মুক্তিস্পৃহা, বিদ্রোহ, ও মুক্তিসংগ্রামের কথা বাদই দিলাম। আমাদের নিকটতম অতীতের মহাবিদ্রোহের কথা বলতে গেলে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কথা বলতে হয়, যেটা ছিল আসলে, মার্কস-এঙ্গেলসের ভাষায়, 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' (Marx Engels, 1988)। তারপর পুরো বৃটিশ ও পাকিস্তান আমল জুড়ে ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাস বিদ্রোহ, অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ, রাজদ্রোহ, অসহযোগ, অনুশীলন, যুগান্তর, পার হয়ে ১৯৫২-র ভাষা-বিদ্রোহ। আমরা ভুলে যাই, ১৯৭১-এ কিন্তু আর্মি ও ইপিআর উভয়ই তদানীন্তন পাকিস্তানী বাহিনীর হুকুম-শৃঙ্খলা বা চেইন-অফ-কমান্ড ভেঙে বিদ্রোহ করেই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ঘটায়। অন্য দিকে, বিশ্ববিদ্যালয় ধারণাটাই বিদ্রোহের সূতিকাগার। মুক্তিযুদ্ধে, ভাষা-বিদ্রোহে, বৃটিশবিরোধী সশস্ত্র-নিরস্ত্র গণজাগরণে, গোটা ষাটের দশক-জোড়া বাংলাদেশ-আন্দোলনে, পাকিস্তানী আমলে এবং বাংলাদেশ-জমানায় সামরিক শাসন বিরোধী গণ আন্দালনে, এবং সর্বশেষ এক-এগারোর সুশীল-সামরিক জরুরি জমানায় জরুরি আইন বিরোধী আগস্টবিদ্রোহে আমাদের ক্যাম্পাসগুলো বিদ্রোহচেতনাকে বয়ে নিয়ে এসেছে আজকের দিন পর্যন্ত। যাঁরা মনে করেন অধিক থেকে অধিকতর কঠোর কর্তৃত্ব কায়েম করতে পারলেই বেয়াড়াদেরকে চিরশায়েস্তা করে সমাজকে বিদ্রোহমুক্ত করে ফেলা সম্ভব হবে, তাঁরা নেহাৎ কর্তৃত্বসুলভ ফ্যান্টাসিতে ভোগেন। কেননা, সমাজে চিরদিনই বিদ্রোহ থাকবে। কেননা, আর সব বাদ দিলেও, বিদ্রোহ মানে নবীনের সাথে প্রবীনের দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্ব চিরদিনের।

> মানবসমাজের ইতিহাসে প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্ব চিরদিন ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব, জাতিবর্ণগত দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, এসব দ্বন্দ্বের যে একদিন অবসান হবে অন্তত তা কল্পনা করতে বাধা নেই। মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হলে এই সমস্ত দ্বন্দ্বের মূল পর্যন্ত সহজে উপড়ে ফেলা যাবে। কিন্তু যতদিন মানুষ থাকবে, সমাজ থাকবে ... ততদিন ... নবীন-প্রবীণের বিরোধও বর্তমান থাকবে। মানুষ ও প্রকৃতির সংগ্রাম এবং নবীন-প্রবীণের সংঘর্ষ এই দুটি ক্ষেত্র থেকে সমাজের গতিশক্তি সঞ্চারিত হবে চিরদিন। (বিনয় ঘোষ, ২০০৫)।

বিদ্রোহীরা স্বপ্ন দেখে সুন্দর ভবিষ্যতের। মানুষ বিদ্রোহ করে সুন্দরের জন্য। মার্কিন সাহিত্যের বিদ্রোহোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব অস্কার ওয়াইল্ড ব্যক্তির স্বাধীনতার জন্য উপযোগী সমাজের চেহারা ভাবতে গিয়ে প্রকারান্তরে মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রের কথা ভেবেছিলেন, যেখানে

> ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানের মধ্য দিয়ে আমরা পাব সত্যিকারের, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। জিনিসপত্র সংগ্রহের পেছনে, জিনিসপত্রের প্রতীকসমূহের পেছনে তখন আর কেউ তার জীবনের অপচয় ঘটাবে না। জীবনযাপন করবে তখন মানুষ। জীবনযাপন করে বেঁচে থাকাটা জগতের সবচেয়ে বিরল ঘটনা। বেশিরভাগ মানুষের অস্তিত্বটুকুন থাকে মাত্র, তার বেশি নয়। (অস্কার ওয়াইল্ড, ১৮৯৫)

বিদ্রোহের মুহূর্ত জুড়ে বিডিআরের সদস্যরা তাঁদের জীবন যাপন করেছেন। আমরা হিমসিম খাচ্ছি আমাদের নিরূপায় নির্লজ্জ অস্তিত্বটুকু নিয়ে। হিমসিম যে খাচ্ছি, সেটা টের পাওয়াটাও হয়ত বিদ্রোহেরই অন্য কোনো নাম। আমাদের সমাজ ইদানিং এরকমই হয়ে উঠছে হয়ত। আমরা চাইলে অন্য রকমও হয়ে উঠতে পারত আমাদের সমাজ-সংসার।

সারণী ০১

বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীসমূহের পরিচিতি

মিলিটারি	ইনটেলিজেন্স এজেন্সি	বর্ডার সিকিউরিটি	ইন্টারনাল সিকিউরিটি	স্পেশাল ফোর্সেস
সেনাবাহিনী	ডিজিএফআই	বিডিআর	পুলিশ	বিসিআরপি
নৌবাহিনী	এনএসআই	কোস্টগার্ড	ডিএমপি সোয়াট	কাউন্টার টেররিজম
বিমানবাহিনী			র‌্যাব	প্যারাকম্যান্ডোজ
				প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট
				স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স
				বাংলাদেশ নেভি স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ (সোয়াড্স্)
			সিভিল ডিফেন্স	
			আনসার/ ভিডিপি	

সারণী-উৎস: www.bdmilitary.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=39

পরিশিষ্ট ০১

বিডিআর-বিদ্রোহের ৫০-দফা দাবি নামা

The New Age, Dhaka, Thursday, 26 February 2009, Front Page
http://www.newagebd.com/2009/feb/26/front.html#e2

Soldiers' 50 major grievances

Staff Correspondent

The Bangladesh Rifles personnel on Wednesday distributed to journalists a leaflet containing their problems and grievances accumulating over the years.

In their letter submitted to the prime minister, they appealed for immediate government measures to address some of their major grievances.

The soldiers said the paramilitary border guards that evolved into Bangladesh Rifles from the erstwhile East Pakistan Rifles, had a glorious role in the country's war of independence which had been imprinted in the hearts of the people.

This force, which had given its arms and ammunition to other forces to fight the independence war and laid down their lives at different times to protect the borders and sovereignty of the country, has itself become subject to oppression, the letter added.

It said that for the BDR Sheikh Mujibur Rahman had appointed 23 officers in 1973 but they had been transferred elsewhere by the military junta of Ziaur Rahman through conspiracy. Today, this force is being oppressed by the army in such a manner which was not done even by the Pakistanis.

In the letter, they said that the 50 demands they were placing were among hundreds of problems they were facing. The 50 demands and grievances are:

1. Recruiting officers for the BDR through BCS examinations for its modernisation, and withdrawing all officers of the army deputed to the BDR which a major demand of BDR soldiers.
2. No steps have been taken, so far, to provide full rationing for the members of this 200-year old paramilitary force. There is neither any ration for its retired soldiers.
3. Members of all forces and agencies, including the Ansars and VDP are being sent to UN peacekeeping missions but

no step has been taken, so far, to send BDR personnel overseas. The pledges, made time and again in this regard, remain unfulfilled.

4. Steps have not been expedited to put an end to discrimination in salary structures and promotion procedures.
5. BDR is being run by the Army's black law. Punitive measures are been taken under the law of 1984.
6. A policy has been formulated to punish and deprive educated and capable persons of promotion.
7. It is only the BDR which is regularly facing war-like situation on the borders but the Army is enjoying the defence allowance sitting back in the barracks.
8. The Army officers have sent many BDR soldiers home showing different excuses during the Operation Dal-Bhat. In fact, Army officers were responsible for the faults.
9. The Army officers also have distributed among themselves the DA meant for the BDR soldiers.
10. All the forces and agencies, except the BDR, had received allowances for duty during the parliamentary and upazila elections. There is a tug of war between the officers for share of the money.
11. In the name of BDR welfare, retired army officers are running 18 shops in different parts of the capital. These shops do not have any BDR personnel.
12. The vehicles bought in the name of BDR's welfare are being used by the Army officers for their private purposes.
13. The schools inside the BDR headquarters have only a few students from the BDR families. Most of the students are children of the Army officers and their relatives. It is unfortunate that being in the BDR we have to send our children to outside schools.
14. Our children are not allowed to take admission to the BDR schools and the excuse is that they lack merit although the schools were built to help our children overcome their deficiency. [When the schools were built, we were told they were meant for our children and for that our predecessors gave their labour.]

15. The wife of the present [BDR] DG was appointed to the post above the principal of the school. A teacher in name only she draws Taka 60,000 as honorarium per month without taking any class.
16. There is a dairy farm inside the BDR and only a few people get its milk and eggs. The milk and eggs, given to the 50 members from the Army, are much more than that given to the 8,000 members of BDR.
17. BDR members do not receive good treatment at the BDR hospital. Only their (army) parents and relatives and people from their villages receive treatment. The BDR members are supplied with cheaper medicines while army officers receive expensive drugs.
18. The BDR Durbar Hall has been leased out to the wife of the present DG for an amount which is one-twentieth of its annual income. All the lakes/ponds of the Pilkhana and other property, including 'Pushpita Simanta', worth crores of taka were leased out in her name or fictitious names for 99 years.
19. The cooks and sweepers of BDR are working at their [army officers] homes and residences of their relations. The BDR troopers have to clean all the streets of Pilkhana before dawn. They work at their [army officers] homes. Even the naik havildars are doing it regularly. The cooks are taken to prepare foods at functions at their relations' homes.
20. The soldiers generally receive lesser amount of ration. But the savings from the allocations for different messes are taken to the homes of army officers and their relations.
21. The soldiers have to care for all the trees of the unit. But the fruits of the trees are sent to their [army officers] homes.
22. No vehicles are purchased for the BDR troopers now. But expensive vehicles like Pajeros are bought, which are mostly used them [army officers] and their relations.
23. The army officers living in Pilkhana must have quarters. But the BDR soldiers or officers are residing out of Pilkhana. After the beginning of the construction of a

residential quarter for the soldiers near the farm, a plan was taken for a quarter for army officers. Although they are living in their quarter, not a single floor has been completed in the soldiers' quarters.

24. The soldiers are subjected to harassment over their leave. They are sent to the borders but have to take leave after coming back to the battalion, which is totally inhuman. BDR soldiers have to work on the borders but their families cannot live there. They are not even granted two months' leave. We cannot enjoy recreation leave although employees in all organisations enjoy it [In 2001 Deshnetri Sheikh Hasina announced two months' leave for BDR personnel after considering their problems. But the army officers stopped it through machinations].
25. They [army officers] come to this organisation with a small trunk but leave with 2/3 trunks.
26. They carry out all the contractors' jobs with their own people.
27. Poor quality food is supplied to the BDR. If we protest, they threaten us with termination of our jobs.
28. The posts designated for officers of BDR are not given properly. Although a few are made officers, they are not given ration/housing and other facilities. They are subjected to harassment.
29. In all services and organisations special emphasis is given on education but in this organisation there no such system. Rather those who are a bit more educated, efforts are made to throw them out of it.
30. If statistics of dismissals from different services and other organisations since the independence of the country are taken, it would be evident that dismissals from services without reason are rare in other organisations.
31. More than 400 officers from the army deputed to the BDR consider its 46,000 members their slaves. An officer needs four to five people for cooking his food. Two [BDR men] are needed for work at the residences of their [Army officers] relations. They are treated like African slaves.
32. In the case of problems on the borders, the Indian border guards generally have a meeting with an army officer in

command [of the BDR troops.] It often turns out that the officer either leaves for a UN mission or is transferred elsewhere. This results in further complication of the problem.

33. The army covertly makes sure that the BDR does not progress in sports (for example, when the army achieves successes in sports it gets good coverage but the BDR wins go almost unnoticed).
34. The BDR athletes and sportsmen are kept heavily involved in administrative and other activities so that they cannot perform well.
35. It is also made sure that the morales of BDR sportsmen and athletes are low. They are given minor awards for their achievements but at those occasions the arrangement for army officers makes it seem as if the prime minister is due to attend.
36. The director general of the BDR has smuggled Tk 30 crore to his mother-in-law's account in the United States.
37. 22 army officers have embezzled Tk 2 crore of Operation Dal-Bhat through bank signatures of BDR personnel.
38. Twenty-two army officers have also embezzled Tk 60 crore from the profits of Operation Dal-Bhat.
39. A relative of the DG went missing with Tk 50 crore of Nur Mohammad Rifles Public School, but the matter was never investigated. [Former] director general Rezaqul Haider Chowdhury took away Tk 40 crore and that incident was not investigated either.
40. It was only because of the greed of some army officers that rice worth Tk 18 per kilogram was sold at Tk 40 per kg, and cooking oil worth Tk 56 was sold at Tk 120 per kg through syndication at the cost of the people's sufferings.
41. Army officers receive 30 per cent extra allowance for being deputed to the BDR, which is sheer wastage of national resources.
42. They do not want to do anything worthwhile for the BDR for it does not bring them [army officers] any benefits. Instead, they are concerned with the army's interests.
43. They use BDR carpenters and tailors for their personal requirements. They not only use BDR's trees for

furnishing their homes but even distribute the timber among their neighbours.

44. Runners/drivers are kept busy even beyond the official duty hours. This results in high consumption of fuel (if it is needed to go a distance of 40 kilometres to buy a button, the army officers make them do that).
45. Although there are a number of human rights organisations in the country, no one talks about our rights which are being violated all the time. (The army officers are careful not to give any hint of it).
46. Those who are a little intelligent in the BDR, are sent to the mental ward on the BDR hospital's third floor, which is used like a prison. The medical board there disqualifies the BDR men as unfit for service.
47. The officers deputed to the BDR are mostly of low calibre with little hope for further promotion. So they run their charges at their whims.
48. We are governed by military rules but our benefits are like those of the ansars/civilians.
49. At combined drills and parades, the BDR contingent outperforms other forces all the time. But to undermine the BDR performance, they are trained by inefficient retired captains.
50. The whole nation knows about the contribution of the BDR in the liberation if this country. But army officers appear to have become desperate to erase the name of this organisation from history.

জয় ও পরাজয়ের কিছুই স্থির নাই। অনেকে শত্রুকে পরাজয় করিতে গিয়া স্বয়ং তাহার নিকটই পরাজিত হয়। ... যিনি শত্রুর সর্বনাশ করিতে উদ্যত হয়েন, তাঁহার আপনার সর্বনাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

মহাভারত, ২০০১: ৫৯১

বইপত্র-ওয়েবসাইট ইত্যাদির হদিস

Ayesha Siddiqa (2007). *Military Inc.: Inside Pakistan's Military Economy*. Pluto Press.

Bakunin, Mikhail (1871), æWhat is Authority?”, Panarchy: www.panarchy.org/bakunin/authority.1871.

Bakunin, Michael (1950). *Marxism, Freedom and the State* (Translated and edited with a Biographical Sketch by K. J. Kenafick), Freedom Press, 1950. (Online version: *Anarchy Archives*, http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist Archives/bakunin/ marxnfree.html.)

Bakunin, Mikhail (1953), æPower and Authority” (An extract from the book *The Political Philosophy of Bakunin: Scientific Anarchism* edited and translated by G. P. Maximoff, Glencoe, IL: Free Press, 1953), *Zine Library*: htpp://zinelibrary.info/power-and-authority-bakunin.pdf.

Doyle, Kevin (1997), æParliament and Democracy”, Wokers Solidarity Movement (Ireland), *Wokers Solidarity*: http://struggle.ws/pdfs/PorD.pdf or http://struggle.ws/wsm/pamphlets/pdf_parliament.html

Emile Durkheim (1964). The Elementary Forms of the Religious Life: A Study in Religious Sociology. London : George. Allen & Unwin.

Feral Faun (1992). æInsurgent Ferocity: The Playful Violence of Rebellion”, From *Anarchy: A Journal Of Desire Armed*, Issue # 33 Summer 1992 republished by Elephant Editions (London) 2000/2001 in the collection "Feral Revolution" reprinted in the pamphlet. http://anti-politics.net/feral-faun/insurgent-ferocity.html.

Kropotkin, Peter (1927), æLaw and Authority” (From *Kropotkin’s Revolutionary Pamplets*, Edited by Roger N. Baldwin, Vanguard Press, Inc., 1927); Online: Anarchy Archives (http://dwardmac.pitzer.edu/).

Kropotkin, Peter (1992). æOn Order”. Chapter 9 of *Words of A Rebel*. Black Rose Books. Online version: Anarchy Archives (http://dwardmac.pitzer.edu/AnarchistArchives/kropotkin/words/wordsofarebel9.html)

Makhno FAQ (2010), æH.6.5 How were the Makhnovists organised?”, http://www.nestormakhno.info/english/makfaq/h_6_5.htm (Retrieved on 10 February 2010).

Mac Manus Patrick (2010), æNine Theses: The Right to Rebellion" (Translated from the Danish by Ron Ridenour), http://www.thecomment factory.com/9-theses-the-right-to-rebellion-2607, Denmark: Rebellion (w ww.opror.net).

Marx Engels (1988). *The First Indian War of Independence 1857-1859*. Sixth Print. Mocow: Progress Publishers.

New Age (2009), æBDR men asked to cease firing: ISPR", *The New Age*, Front Page, Dhaka, Thursday, February 26, http://www.newagebd.com/ 2009/feb/26/front.html#15.

Orwell, George (2001). *Nineteen Eighty-Four*. A Project Gutenberg of Australia eBook. (eBook No.: 0100021.txt; Date first posted: August 2001; Date most recently updated: November 2008). http://gutenberg.net. au/ebooks01/0100021.txt (Retreived on 10 February 2010).

Orwell, George (1954). *Nineteen Eighty-Four*. Gateshead, Middleex, England: Penguin.

Russel, Bertrand (1992). *Power: A New Social Analysis*. London: Routledge.

অস্কার ওয়াইল্ড (১৮৯৫)। *মানুষের আত্মা*। "সমাজতন্ত্রে মানুষের আত্মা" ("সোল অফ ম্যান আন্ডার সোশ্যালিজ্‌ম্") নামে আদি প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল ১৮৯১ সালে *পাক্ষিক পর্যালোচনা* (*ফোর্টনাইটলি রিভিউ*) পত্রিকায়। তথ্যসূত্র: Yahoo! UK & Ireland Answes, http://uk.answers.yahoo. com/question/index?/qid=20090711089 36AAeuaGD (ইন্টারনেট থেকে তথ্য-সংগ্রহ: ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১০)।

আলতাফ পারভেজ (১৯৯৫-ক), "আনসার বিদ্রোহ: আলী মর্তূজার উদোম লাশ এবং কবরস্থ না-হওয়া একটি প্রশ্ন" (কাউন্টার রিপোর্টিং সিরিজ: এক), ফ্রেব্রুয়ারি, ঢাকা: দীপ্র প্রকাশ, ৬৮/২ পুরানা পল্টন মোড়।

আলতাফ পারভেজ (১৯৯৫-খ), "আনসার বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন: ব্যাটালিয়ন আনসাররা বলছে 'ছয় জন আমলা এবং একজন জেনারেল আমাদের বিদ্রোহে বাধ্য করেছে'", *চিন্তা*, সংখ্যা ২১–২২, জুলাই, ঢাকা।

আলতাফ পারভেজ (২০০০)। *কারাজীবন কারাব্যবস্থা কারাবিদ্রোহ*। ঢাকা: ব্লাস্ট (BLAST)।

আবুল ফজল (২০০৫)। "নবী ও জাতীয় পতাকা", *সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র* (প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ ১৩৭৫/এপ্রিল ১৯৬৮), ঢাকা: গতিধারা।

আসিফ নজরুল (২০০৯), "পিলখানা হত্যাকাণ্ড: সর্বনাশের নতুন পর্ব (?)", *প্রথম আলো*। পৃষ্ঠা ১০: 'সম্পাদকীয়'। ১৭ই মে। ঢাকা।

আল কোরান (১৪১৩ হিজরি)। "সুরা কাফেরুন" (সুরা নং ১০৯)। *পবিত্র কোরআনুল করীম* (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর)। খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহ্‌দ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প মদীনা মোনাওয়ারা কর্তৃক রাজকীয় সউদী সরকারের হজ্ব ও আওক্বাফ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পাদিত। মুদ্রণস্বত্ব 'খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহ্‌দ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প', পোঃ বক্স নং ৩৫৬১, মদীনা মোনাওয়ারা।

এরিক ফ্রম (১৯৬৯)। "সহিংসতার ধর্ম"। *কলিয়েরস ইয়ারবুক*। বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি *মাইক্রোসফ্‌ট্ এনকার্টা রেফারেন্স লাইব্রেরি ২০০৪* এর "দ্য নেচার অফ ভায়োলেন্স" (কপিরাইট মাইক্রোসফ্‌ট্ কর্পোরেশন ১৯৯৩-২০০৩) রচনা থেকে সেলিম রেজা নিউটন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত।

এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান এবং এস আর মীর্জা (২০০৯)। *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর: কথোপকথন*। ঢাকা: প্রথমা।

কলিম খান (১৯৯৫)। *মৌল বিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে*। কলকাতা: হাওয়া ৪৯।

কামরুল হাসান (২০০৯-ক), "আসামির সংখ্যা কমিয়ে আনার চিন্তা/বিডিআর আইনে বিচার শেষ হলে ফৌজদারি আইনে বিচার: জওয়ানেরা সাক্ষ্য দিতে চাইছেন না", *প্রথম আলো*, ৫ই নভেম্বর, প্রথম পাতা, ওপরের ভাঁজে বাম দিকে।

কামরুল হাসান (২০০৯-খ), "বিদ্রোহে উসকানির শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড", *প্রথম আলো*, ৬ই নভেম্বর, প্রথম পাতা, ওপরের ভাঁজে ডান দিকে।

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (১৯৯৪)। *ধর্ম প্রসঙ্গে*। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

জেফারসন (১৭৮৭)। *টমাস জেফারসনের জীবন ও নির্বাচিত রচনাবলী* (দ্য লাইফ অ্যান্ড সিলেকটেড রাইটিংস্ অফ টমাস জেফারসন), অ্যাড্রিয়েন কোচ এবং উইলিয়াম পেডেন কর্তৃক সম্পাদিত, নিউ ইয়র্ক: র‍্যানডম হাউস, ১৯৪৪। বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি *মাইক্রোসফ্‌ট্ এনকার্টা রেফারেন্স লাইব্রেরি ২০০৪* এর "লেটার ফ্রম টমাস জেফারসন অন শেইয়েজ রিবেলিয়ন" (কপিরাইট মাইক্রোসফ্‌ট্ কর্পোরেশন ১৯৯৩-২০০৩) রচনা থেকে সেলিম রেজা নিউটন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত।

তেহরান বাংলা রেডিও (২০০৯)। "সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ব্যর্থতার কারণেই বিডিআর বিদ্রোহ করেছে: সাবেক বিডিআর প্রধান"। bangla.irib.ir/index.php?option=com_content &task=view&id=9292। ২৫শে ফেব্রুয়ারি। (এ তথ্য ২৫শে নভেম্বর ২০০৯ তারিখে ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত হয়েছে।)

নোম চমস্কি (১৯৭০)। "ভবিষ্যতের সরকার", নিউ ইয়র্কের যুবক-যুবতীদের হিব্রু সমিতি'র কবিতা-কেন্দ্রে ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত শ্রুতি-সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা। মূল অডিও: www.chomsky.info/audionvideo/19700216.mp3। বক্তৃতাটির ইংরেজি অনুলিখন: tangible info.blogspot.com/2006/11/noam-chomsky-lecture-from-1970-full.html। অনুবাদ: সেলিম রেজা নিউটন, *মাওরুম*, বর্ষ ৬ সংখ্যা ১৫ মে ২০০৯, ঢাকা: হিল রিসার্চ এন্ড প্রোটেকশন ফোরাম।

প্রথম আলো ব্লগ (২০০৯)। "সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ব্যর্থতার কারণেই বিডিআর বিদ্রোহ করেছে: সাবেক বিডিআর প্রধান"। *প্রথম আলো ব্লগ*, প্রথম পাতা: http://prothom-aloblog.com/users/base/broadcaster/151। ২৫শে ফেব্রুয়ারি। (এই তথ্য ২৫শে নভেম্বর ২০০৯ তারিখে ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত হয়েছে।)

ফরহাদ মজহার (১৯৯৫), "আনসার বিদ্রোহ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মুখোশ", *চিন্তা*, সংখ্যা ২১–২২, জুলাই, ঢাকা।

বিনয় ঘোষ (২০০৫)। *বিদ্রোহী ডিরোজিও*। চতুর্থ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০০৫। (আদি সংস্করণ মার্চ ১৯৬১।) কলকাতা: বাক-সাহিত্য।

মঙ্গল কুমার চাকমা (সম্পা.) (২০০৯)। মানবেন্দ্র লারমা: জীবন ও সংগ্রাম। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ। রাঙামাটি: এম. এন. লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন ।

মহাভারত (২০০১)। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত *মহাভারত*। দ্বিতীয় খণ্ড। শান্তিপর্ব, দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়: "কালকবৃক্ষায়ের উপায়ন্তর উপদেশ–জনকবৃত্তান্ত"। রাজ সংস্করণ। নূতন মুদ্রণ: জানুয়ারি। কলকাতা: তুলিকলম।

মিখাইল বাকুনিন (২০০৭), "রাজনীতি ও রাষ্ট্র" (অনুবাদ: সেলিম রেজা নিউটন), *বাউণ্ডুলে* (রাসেল মাহমুদ সম্পাদিত), ISSN 1993-3290, ৩য় সংখ্যা ফেব্রুয়ারি, খুলনা। আদি উৎস: Mikhail Bakunin (1871), æPolitics and State" in *Bakunin's Writings* edited by Guy A. Aldred, Modern Publishers, Indore Kraus Reprint Co. New York, 1947.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০২ বঙ্গাব্দ)। *কালের যাত্রা*। কলকাতা। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। একাদশ খণ্ড। ১২৫তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ; আষাঢ় ১৩৯৭; পুনর্মুদ্রণ ১৪০২। প্রকাশক: শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়। কলকাতা: বিশ্বভারতী। *কালের যাত্রা* বাংলা ১১৩৩৯ সালের [১৯৩২] ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ [১৯২৪] সালের অগ্রহায়ন-সংখ্যা *প্রবাসী*-তে প্রকাশিত "রথযাত্রা" নামের নাটিকার 'পরিবর্তিত ও আগাগোড়া পুনর্লিখিত রূপ' "রথের রশি" নাম নিয়ে এই বইয়ে প্রকাশিত হয়।

শাহদীন মালিক (২০০৯)। "ল্যাঠা চুকে যাক!"। *প্রথম আলো*। পৃষ্ঠা ১২: 'সম্পাদকীয়'। শুক্রবার ৮ই মে। ঢাকা।

সংবিধান (১৯৯৪)। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*। আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা: গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস।

সুমন চট্টোপাধ্যায় (১৯৯২), "তিন তালের গান", *সুমনের গান: তোমাকে চাই*, কলকাতা: দ্য গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড।

সেলিম রেজা নিউটন (১৯৯২), "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও একটা কালো বেড়াল লুকিয়ে আছে", সাপ্তাহিক *যায়যায়দিন*, বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৮ মঙ্গলবার, ১১ই আগস্ট।

সেলিম রেজা নিউটন (২০০৪), "বাদশাহী বিশ্ববিদ্যালয়", *প্রথম আলো* (শুক্রবারের সাময়িকী), সম্ভবত নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসের কোনো একটা শুক্রবারের সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল কবিতাটা, হাতের কাছে পত্রিকাটা পাচ্ছি না বলে আপাতত তারিখটা জোগাড় করা গেল না।

সেলিম রেজা নিউটন (২০০৯)। "মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট: কর্তৃত্বপরায়ন সমাজতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন রূপকল্প", *সমবীক্ষণ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, চট্টগ্রাম: সমাজ সমীক্ষা সংঘ।

হেনরি গার্নেট (১৮৪৩)। "বিদ্রোহের ডাক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাসদের প্রতি অভিভাষণ"। বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি *মাইক্রোসফ্ট্ এনকার্টা রেফারেন্স লাইব্রেরি ২০০৪* এর "কল টু রিবেলিয়ন" (কপিরাইট মাইক্রোসফ্ট্ কর্পোরেশন ১৯৯৩-২০০৩) রচনা থেকে সেলিম রেজা নিউটন কর্তৃক বাংলায় অনূদিত।